গার্হস্থ্যধর্ম্ম

বা

নারীধর্ম্মের পরিশিষ্ট।

অমিয়গাথা, ব্রজগাথা প্রভৃতি প্রণেত্রী

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী

প্রণীত।

জামালপুর, বৰ্দ্ধমান হইতে

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুস্তোফী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

মূল্য ॥০ আট আনা।

প্রাতঃস্মরণীয়া অশেষ গুণালঙ্কৃতা

শ্রীল শ্রীযুক্তা দিনাজপুরের মহারাণীর

পবিত্র ও গৌরবান্বিত নামে

ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি স্বরূপ

এই গ্রন্থ

উৎসর্গীকৃত

হইল।

বিনম্রাবনতা

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।

ভূমিকা।

আমার গুরুজনবর্গের আদেশ ও আশীর্ব্বচন গ্রহণ পূর্ব্বক নারীধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলাম। তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে এই গ্রন্থ সমাজে যথেষ্ট আদরণীয় হইয়া প্রথম সংস্করণ অতি অল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষ হইয়াছে এবং গুণগ্রাহী টেক্সট্‌বুক্ কমিটীর মহোদয়গণ উহা প্রাইজ্ এবং স্কুল লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত করিয়া আমাকে পরম উৎসাহিত করিয়াছেন।

পূর্ব্ববৎ গুরুজনবর্গের আশীর্ব্বচন গ্রহণান্তে নারীধর্ম্মের পরিশিষ্ট স্বরূপ এই গার্হস্থ্যধর্ম্ম গ্রন্থখানি সাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম। পূর্ব্বের ন্যায় সমাজ ও নারীজাতি এবং গুণ-গ্রাহী টেক্সট্‌বুক্ কমিটীর মহোদয়বৃন্দ এই গ্রন্থখানিকেও অনুগ্রহের চক্ষে দেখিলে আপনাকে কৃতার্থজ্ঞান করিব।

জামালপুর।
জেলা বর্দ্ধমান।
১৯০৪, ১লা মে।

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা।

সূচী।

গার্হস্থ্যধর্ম্ম।

গার্হস্থ্যজীবনে নারীজাতীর কর্ত্তব্য।

শাস্ত্র বলিয়াছেন—

যস্মাৎ ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমোগৃহী॥

মনু—৩—৭৮।

অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমবাসীগণের নিকট সকল আশ্রম বাসীগণ (বানপ্রস্থ ভিক্ষু প্রভৃতি) উপকৃত হইয়া থাকেন এই জন্যই সর্ব্ববিধ আশ্রম অপেক্ষা গার্হস্থ্যাশ্রম শ্রেষ্ঠ। তবেই দেখা যাইতেছে সমগ্র মানবের হিত সাধনই এখানকার প্রধান কর্ত্তব্য।

পরিচালিত করা যায় তাহা সেইদিকেই তীব্রভাবে নিয়োজিত হয় সদ্দিকে দাও অমৃতময় ফল ফলিবে, অসদ্দিকে দাও অধোগতির চরম সীমায় নীত হইবে, এমতে তাঁহারা সুশিক্ষিতা হইলে সংসার শান্তিময় হইবে, রমণীর তেজস্বিতা, রমণীর একাগ্রতা সংসারকে পাপের হস্ত হইতে রক্ষা করিবে, ইহাই রমণী জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে অশিক্ষিতা করিয়া রাখিলে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ত্রুটী ঘটে অতএব যাঁহারা নারীজাতির শিক্ষা হীনতাকেই সংসারের সুখ মনে করেন তাঁহারা ভ্রান্ত তাঁহারা আপনাদিগের ও ভাবী বংশধরগণের সুখের পথে কণ্টক রোপণ করেন মাত্র, কারণ নারীজাতি অশিক্ষিতা হইলে তদীয় সংসর্গে সুশীল চরিত্র স্বামীও দুঃশীল হইয়া পড়েন, পুত্র অসদ্ভাবাপন্ন হন গৃহের অন্যান্য সহযাত্রীগণ অধঃপতিত হন।

রমণী যতই জ্ঞানরাজ্যে আরূঢ় হইতে পারিবেন, সংসারও ততই উন্নতিমুখীন হইবে। প্রত্যেক সংসার উন্নত হইলে সামাজিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। যে রমণীর হস্তে সংসার চালিত সে রমণীজাতিকে অজ্ঞান করিয়া রাখা কোনমতেই কর্ত্তব্য নহে। সংসারে গুরুজন-বর্গের সেবা, দাসদাসিগণের পরিচর্য্যা, অতিথি অভ্যাগতের সৎকার, পীড়িতের শুশ্রূষা প্রভৃতি কার্য্যের সহিত স্বীয়ধর্ম্ম শাস্ত্র আলোচনা করা অবশ্যই নারীজাতির কর্ত্তব্য।

সংসারের সমাজের ইষ্টানিষ্ট গভীরভাবে অনুভূতি করিয়া কবিতা বা চিত্রাদির দ্বারা তাহা উজ্জ্বলরূপে অঙ্কিত করিয়া সমাজের সমক্ষে উপনীত পূর্ব্বক সমাজকে উন্নতিপথে আহ্বান করিতে প্রস্তুত হওয়া রমণীর উচিত। রমণী হৃদয় স্বতঃই শিল্পময় সেই শিল্পনৈপুণ্যের সহিত জ্ঞানের সংমিশ্রণে রমণীর আহ্বান শ্রবণে এই বিশাল বিশ্বদোদুল্যমান হইয়া উঠিবে সমাজের অশান্তি অবনতি বিদূরিত হইবে।

রমণীগণ কেবল আহার নিদ্রা রাঁধা বাড়া লইয়া থাকিলে সমাজের উন্নতি হইবে না অথবা পুরুষের সমকক্ষ হইয়া সভাসমিতিতে বক্তৃতা দিলেই ভারত জাগিবে না। তাহাদের আত্মার অনুশীলন, দেবানুরক্তি এবং তৎপরে কঠোর সংযম, আত্মত্যাগ, পরহিতৈষিতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা প্রভৃতির বিকাশেই সমাজের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে। নারীজীবন এইরূপে নিয়ন্ত্রিত হইলেই গার্হস্থ্যধর্ম্মের গৌরব এবং নারীজাতির পবিত্রতা রক্ষা হইবে।

নারীজাতির এই অমূল্য গুণাবলী তাঁহাদের সন্তান সন্ততিতে সম্বেষ্টিত হইয়া সংসার হইতে পাপের চিত্র মুছিয়া ফেলিবে।

ধর্ম্ম জীবন।

ধর্ম্ম জীবনই মানুষের মনুষ্যত্ব মানুষ যদি তাহার ধর্ম্ম প্রাণতা বলি দেয় তবে তৎসহ তাহার মনুষ্যত্ব ও বিলুপ্ত হয়।

মনুষ্যত্ব বিলুপ্ত হইলে মানুষ পশু নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হয়। ধর্ম্মপ্রাণতাহীন মানবসংসর্গে সংসার যন্ত্রণা ভূমি হইয়া উঠে, সমাজ দগ্ধ হইয়া যায়। অতএব ধর্ম্মজীবন রক্ষা করিতে যত্নপর হওয়া মানব মাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনেকে মনে করেন নারীজাতি কেবল পুরুষের বিলাসিতার সামগ্রী, কেবল মাত্র পুরুষ জাতির মনোরঞ্জন করা স্ত্রী জাতির ধর্ম্ম। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া স্ত্রী জাতির শিক্ষা বা তাহাদের ধর্ম্মজীবন রক্ষার্থে সমাজ সম্পূর্ণ উদাসীন।

স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতির হিতাকাঙ্খিণী তাহাদের শান্তিদায়িনী সত্য কিন্তু কেবল বিলাসিতা চরিতার্থের বস্তু নহে।

জগতে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পক্ষেরই সমান দায়িত্ব আছে কোন পক্ষের একটু ক্রটী ঘটিলেই সমাজের অনিষ্ট সংঘটন

হয়। সংসারে পুরুষ স্বামি ও পিতা, রমণী মাতা ও স্ত্রী। পুরুষ জাতির স্বামি ও পিতৃত্বের জন্য যেমন দায়িত্ব আছে স্ত্রীজাতিও তদ্রূপ স্ত্রী ও মাতৃত্বের জন্য সমাজের নিকট দায়ী। এই উভয় পক্ষের দায়িত্বই অতীব গুরুতর। মাতা যদি কর্ত্তব্য জ্ঞানশূন্যা, দুর্ম্মতি দুঃশীলা হন, তবে তদীয় স্তন্যপায়ী পুত্র কন্যা ও সেইরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। শিশুগণ পিতা অপেক্ষা মাতারই অনুরূপ চিত্র হইয়া থাকে সুতরাং সমাজে ক্রমশঃ কতকগুলি কাণ্ডজ্ঞানহীন মানব রূপী পশু উৎপন্ন হইয়া সমাজে যন্ত্রণার একশেষ করিবে। এমতে মাতৃজাতির (স্ত্রী জাতির) শিক্ষার প্রতি তাঁহাদের ধর্ম্ম প্রাণতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে গঠিত করিয়া লওয়া সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অনেকে বলেন ধার্ম্মিক হইলে সংসার চলেনা এ কথা মূল্যহীন। পরন্তু প্রকৃতপক্ষে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মপ্রাণতা আবশ্যক কারণ যাঁহারা বৈরাগ্যাবলম্বন পূর্ব্বক অরণ্য-বাস করিয়া থাকেন তাঁহা-দের সহিত সাধারণের ততটা ঘনিষ্ঠতা থাকে না, তাঁহারা সংসারে নির্লিপ্ত সুতরাং তাঁহাদের দ্বারা সাধারণে বিশেষ উপকৃত বা অনুপকৃত হইতে পারেননা কিন্তু গৃহস্থ ব্যক্তির সহিত সাধারণের এতই ঘনিষ্ঠতা এতই মিশামিশি যে গৃহস্থ ব্যক্তি পাপপরায়ণ হইলে এক জনের জন্য বহু-লোকের অনিষ্ট হয়। আবার গৃহী ব্যক্তি ধার্ম্মিক হইলে

তদীয় সংসর্গে বহু লোক উন্নতি লাভ করিতে পারেন। এই জন্যই গৃহস্থ ব্যক্তির সমধিক ধর্ম্ম পরায়ণ হওয়া প্রয়োজন।

হিন্দুর সংসার কেবল স্বামী, পুত্র, স্ত্রী লইয়া নহে। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃজায়া,, ভগিনী, মামি মাসি, পিসি, প্রভৃতির সম্মিলনে হিন্দুর সংসার গঠিত। হিন্দুর সংসার একটি রাজ্য বিশেষ; গৃহিণী সুদক্ষ না হইলে নানারূপ অভাব, অশান্তি, মনোমালিন্য প্রভৃতিতে এই রাজ্য ছারখার হইয়া যায়। ধর্ম্মপ্রাণতা হইতেই সমদর্শিতা ও সুদক্ষতার উৎপন্ন হয়। অতএব রমণীজাতিকে সর্ব্বথা ধর্ম্মপ্রাণতার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। রমণী সংসার রাজ্যের পালন কর্ত্রী। পুরুষ অর্থ দিয়া বহু পরিমাণে খালাস, সকলের সুখ স্বচ্ছন্দ শান্তি প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া নারীজাতিকে পরিচালিত হইতে হয় অতএব পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীজাতির দায়িত্ব অধিক। এমতে নারী জাতি ধর্ম্মপ্রাণতা হইতে বিচ্যুত হইলে মানব জীবন বিষময় হইয়া উঠিবে।

মানবের জন্য শ্রেয় এবং প্রেয় দুইটি পথ নির্দ্দিষ্ট আছে। শ্রেয়াবলম্বনকারী অধ্যাত্ম চিন্তায় পারদর্শিতা লাভ করেন যিনি প্রেয়কে গ্রহণ করেন তিনি ধর্ম্মপ্রাণতা হইতে বিচ্যুত হইয়া নানারূপ যন্ত্রণায় মুহ্যমান হইয়া থাকেন।

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্য দুতৈব প্রেয়
স্তে উভে নানার্থে পুরুষ সিনীত।
তয়ো শ্রেয়ঃ আদ দানস্যসাধু র্ভবতি
হীয়তে ঽর্থাৎ যউ প্রেয়ো বৃণীতে।

কঠোপনিষৎ।

এমতে প্রেয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রেয় গ্রহণ করাই মানবের উচিত। আধ্যাত্মিক জ্ঞান সম্যক স্ফূর্ত্তি লাভ করিলেই সাংসারিক কর্ত্তব্যজ্ঞান ও উজ্জ্বলীকৃত হয়। শ্রেয়াবলম্বনকারীর সংসারই গার্হস্থ্যাশ্রমের গৌরব স্থল। এই সংসারের শীতল ছায়াতলে সর্ব্ববিধ আশ্রমবাসিগণ শান্তিলাভ করিয়া থাকেন এইরূপ সংসারই প্রকৃত ভগবৎ সংসার।

এক্ষণে দেখা যাউক এই অমূল্য ধর্ম্মপ্রাণতা কিরূপে অক্ষত থাকিতে পারে।

দয়া, প্রীতি, নিঃস্বার্থতা, সংযম, সাধুতা, আত্মসুখস্পৃহা শূন্যতা, নির্লোভতা, অহিংসাপরতা উদারতা, সহিষ্ণুতা, সন্তোষ প্রভৃতি বৃত্তিগুলির সম্যক অনুশীলনই ধর্ম্ম জীবন রক্ষার প্রধান উপায়।

আমাদের মধ্যে অনেকেরই আত্মদম্ভ বৃত্তি বড়ই তীব্র আত্মদম্ভের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা বহু শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হই। সৎশিক্ষার অভাব ঘটিলে ধর্ম্মজীবন মার্জ্জিত

হইতে পারেনা। অতএব আত্মদম্ভ পরিহার পূর্ব্বক সর্ব্ব প্রাণীর নিকট হইতেই সৎশিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। একটা চলিত কথায় আছে "বড় হবি ত ছোট হ"। বস্তুতঃ যে বড় সেই আত্মদম্ভত্যাগী। ফলশালী বৃক্ষ কেমন অবনত! দাম্ভিক কখনও লোক চিত্তাকর্ষণে সমর্থ হয় না। দাম্ভিক ব্যক্তি সকলেরই ঘৃণার পাত্র।

আমরা স্বতঃই দেখিতে পাই জগতে যে সকল মহাত্মা মহাজন বলিয়া পরিচিত আছেন তাহাদের মধ্যে সকলেই আত্মদম্ভ পদদলিত করিয়া জগতের হিতার্থে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "এক গণ্ডে চপেটাঘাত করিলে অপর গণ্ড পাতিয়া দিবে"—কি সুন্দর আত্মদম্ভত্যাগী মহান্ উক্তি!

মহম্মদ বিপুল ঐশ্বর্য্যেরশ্বর হইয়াও জগতের মঙ্গলের জন্য কত নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও অত্যাচারীদিগকে সর্ব্বদাই বলিয়াছেন, "ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।" শ্রীগৌরাঙ্গদেব বহুলোকচিত্তে পূর্ণব্রহ্মরূপে পূজিত হইয়াও জীবের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া কাঁদিয়া হরিনাম সাধিয়া বেড়াইয়াছেন। তবেই দেখা যাইতেছে দাম্ভিক অপেক্ষা দম্ভত্যাগীর আসন অতি উচ্চে সংস্থাপিত।

মানুষের অধঃপতনের আর একটি কারণ সুখ প্রিয়তা। সুখের জন্য মানুষ প্রতিনিয়ত ব্যস্ত, মানুষ ধর্ম্মাধর্ম্ম যে কোন কার্য্যানুষ্ঠানই করুক না কেন সকল কার্য্যেরই মূল

সুখান্বেষণ। অর্থ হইতে সুখের উৎপত্তি অনেকেরই এই ধারণা বদ্ধমূল, তাই মানুষ অর্থলাভের জন্য এত ব্যাকুল। তাই স্বামীর অর্থে অন্যান্য পরিবারবর্গকে প্রতিপালিত হইতে দেখিলে অনেক স্থলে গৃহিণীর প্রাণে দারুণ কষ্ট হয় তিনি সেই অর্থ সঞ্চয় করিয়া সুখী হইবার বাসনায় স্বামীর অনাথ সহোদরটীকে ও পৃথকান্নের ব্যবস্থা করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু ইহা হৃদয় হীনতার কার্য্য, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। অর্থ সুখের আনুসঙ্গিক উপায় মাত্র, অর্থ হইতে সুখের উৎপত্তি নহে কর্ত্তব্যানুশীলন হইতেই সুখের উৎপত্তি, দায়িত্ব পালন হইতেই সুখের অমৃতময় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ লাভ হয়।

সৎ উপায়ে যে অর্থাগম হয় তাহা হইতে সুখের ছায়া অনুমিত হইতে পারে কিন্তু অসৎ উপায়ে যে সকল অর্থাগম হয় তাহা যন্ত্রণার কারণ মাত্র। অতএব সংসারে যাহাতে কেহ কোন রূপে অসদুপায়ে অর্থাগমের চেষ্টা না করেন গৃহিণীকে তদ্দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। গৃহিণী গার্হস্থা-শ্রমের শান্তি বিধায়িনী এমতে তিনি অশান্তি সকল নিবারণে ত্রুটী করিলে সমাজের নিকট—ঈশ্বরের নিকট—অপরাধী হইবেন এবং তাহার ফলে নিজেও নানারূপ অশান্তিভোগ করিবেন। পুরুষ সমাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলেও স্ত্রী জাতির যুক্তি, স্ত্রী জাতির পরামর্শ, তাঁহা-দিগকে বিশেষ রূপে আকৃষ্ট করিতে পারে। স্ত্রী জাতীর

সম্মিলনেই পুরুষের ঐশী শক্তির বিকাশ হয়। ঐশী শক্তির অধিকারিণী হইয়া যে রমণী সংসার হইতে পাপ-স্রোত নিবারণ করিতে পারেন তিনিই সুগৃহিণী তাঁহারই নারীজন্ম সার্থক। এইরূপ মহিয়সী রমণীরত্নই গার্হস্থ্য ধর্ম্মের ভূষণ।

মানুষ যখন মোহ প্রভৃতির হস্ত এড়াইয়া উন্নতি পথে ধাবিত হইবার চেষ্টা করে তখন অনেকেই তাহাকে পথ-ভ্রান্ত করিবার জন্য ব্যাকুল চিত্ত হন। শ্রীচৈতন্যদেবকেও অনেকেই বাতুল বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিল তখন "অন্য পরে কা কথা।" অতএব খুব দৃঢ় চিত্তে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলিতে পারিলে তবেই ধর্ম্মপ্রাণতা রক্ষা হইতে পারে। আবার কেবল মানুষের চেষ্টাতেই যে মানুষের পতন তাহা নহে। মানব প্রকৃতি এত চঞ্চল যে অনেক সময় তাহাকে আয়ত্বাধীনে রাখিয়া সৎপথে ধাবিত হওয়া মানবের পক্ষে দুরূহ। ইন্দ্রিয় বিজয়ী মহাবীর শাক্য-সিংহকেও কাম ছলনা করিতে আসিয়াছিল; কিন্তু মহা-বীর শাক্যসিংহ উত্তর করিলেন;—

মেরু পর্ব্বত রাজস্থান তু চলেৎ সর্ব্বং জগন্নোভবেৎ।
সর্ব্ব তারক সঙ্ঘ ভূমি প্রপতেৎ সজ্যোতিষেন্দ্রনভা॥
সর্ব্বে সত্ব কারয় এক মতয়ঃ শুষ্যোন্মহা সাগরো।
নত্বেবদ্রুম রাজমূল পগতশ্চাল্যেত অস্মাদ্বিধ॥

ললিত বিস্তর।

যিনি এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া কার্য্য করিতে পারিবেন তাঁহারই ধর্ম্ম জীবন অক্ষত থাকিবে।

অধুনা একঘরে "সাত হাঁড়ি" প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ ভিন্ন ভাগাদি ধর্ম্ম জীবন রক্ষার বিষম অন্তরায়। কর্ত্তব্যহীনতা বশতঃ এত ভিন্ন ভাগের সৃষ্টি। কর্ত্তব্যহীন হইলেই ধর্ম্ম জীবন পঙ্কিল হয় বিশেষতঃ একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে বাস করা ধর্ম্মজীবন প্রসারিত হইবার একটী সুন্দর উপায়। পৃথক পরিবারে কেহ কাহারও জন্য দায়ী নহে। কিন্তু একান্নবর্ত্তী পরিবারে একের জন্য অন্যে স্বার্থ বলিদান করিতে বাধ্য। এই বাধ্য বাধকতা হইতে মানুষের স্বভাব এমন সুন্দর ভাবে গঠিত হইয়া পড়ে যে সে প্রশস্ত হৃদয়ে সঙ্কীর্ণময় স্বার্থের স্থান হয় না সে হৃদয় বিশ্বের হিতার্থে সহজেই উন্মুক্ত হইতে পারে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে থাকিতে হইলে বহু প্রকৃতির সহিত স্বীয় প্রকৃতি মিলিত করিয়া সংসার করিতে হয় সুতরাং অভ্যাস ক্রমে এই বাধ্যবাধকতা হইতে ক্রমে আত্মসংযম করিবার বিশেষরূপ ক্ষমতা জন্মে। যিনি আত্মসংযম করিতে সমর্থ তাঁহার ধর্ম্মজীবন অক্ষত থাকে। যিনি একান্নবর্ত্তী সংসারে কয়েকজন মাত্র মনুষ্যের প্রকৃতির সহিত স্বীয় প্রকৃতি মিলাইয়া সংসার করিতে না পারেন তাঁহার চিত্ত বড়ই দুর্ব্বল সে চিত্ত বিশাল বিশ্বের মঙ্গল সাধনার্থে উৎসর্গীকৃত হওয়া সম্ভব পর নহে।

স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এমতে একান্নবর্ত্তী সংসার রূপ দৃঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতে পারিলে তাহাদিগের চরিত্র অভ্যাসক্রমে পরম শক্তিময় হইয়া উঠে। ক্ষুদ্র সংসারে যে স্বার্থ যে সুখস্পৃহা প্রভৃতি বলিদান হয় ক্রমে তাহা সমগ্র বিশ্বের জন্য অর্পিত হওয়া সম্ভবপর হয়। অতএব একান্নবর্ত্তী সংসার হইতেই বিশ্ব প্রেমের বিকাশ হয় ইহা অকপট চিত্তে বলা যাইতে পারে।

অনেকের মতে একান্নবর্ত্তী সংসারে অন্যের অধীনতা প্রযুক্ত মানব চরিত্র উদ্যমশীলতা শূন্য হইয়া জড় বিশেষ হইয়া পড়ে আপনার তেজস্বিতা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে বরং অধিক বয়স পর্য্যন্ত অন্যের অধীনতায় বাস করিয়া সেই গৃহস্বামি বা স্বামিনীর উদ্যম উৎসাহ তেজস্বিতা প্রভৃতি কিরূপ ভাবে উৎপন্ন হইয়া কিরূপ ভাবে তাহা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে আমরা তাহা বিশেষরূপে শিক্ষা করিতে পারি।

একান্নবর্ত্তী সংসারে আমরা আদর্শ পাই সুতরাং সহজেই আপনাকে গঠিত করিয়া লইতে পারি কিন্তু পৃথক সংসারে আদর্শের অভাব সেখানে আপনাকে আপনি চালাইতে হয়। আদর্শ ব্যতীত মানব জীবন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়না এই জন্যই পৃথক সংসারে যে উচ্ছৃঙ্খলতা স্বেচ্ছাচারিতার সম্ভব একান্নবর্ত্তী সংসারে তাহার সম্ভব থাকেনা। এখানে আদর্শ ভাল হইলেই অধীন ব্যক্তি আপনাকে

উন্নত করিতে সমর্থ হয়। এই জন্যই পৃথক সংসারাপেক্ষা একান্নবৰ্ত্তী সংসারই মানবকে দেব প্রকৃতি করিয়া গঠিত করিতে পারে। একান্নবৰ্ত্তী সংসারে অনেক অলস অকৰ্ম্মণ্য ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় সত্য কিন্তু সে দোষ প্রথার নহে—আদর্শের। সংসারে যাঁহারা স্বামী বা গৃহিণী তাঁহারাই অধীন ব্যক্তির আদর্শ। এমতে তাঁহারা সৎ না হইলে সংসারে অন্য সকলে সৎ হইতে পারে না; এই জন্যই মাতা পিতা সৎস্বভাব সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন। অলস অকৰ্ম্মণ্যতা প্রভৃতি যে দোষ সকল মানবের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করে সেই দোষ সকল রমণী জাতির অপরিণামদর্শিতারই ফল। পুত্রগণ জননীর স্নেহেই বৰ্দ্ধিত অনেক স্থলে জননীর স্নেহ এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যে তাহা হইতে পুত্র অলস অকৰ্ম্মণ্য উচ্ছৃঙ্খল প্রভৃতি দোষে দূষিত হইয়া পড়ে। এমনও দেখা যায় কৰ্ত্তার অতি ক্লেশাৰ্জ্জিত সামান্য মাত্র টাকা কয়টিতে সংসারযাত্রা নিৰ্ব্বাহ হয় জননীর কুক্রিয়াসক্ত স্নেহের গোপাল কুকাৰ্য্য করিয়া ব্যয় করেন সংসার চলা ভার। জননী পুত্র স্নেহান্ধ হইয়া কৰ্ত্তার অজ্ঞাতে গোপালের মনোরঞ্জন করিয়া গোপালের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলেন। নারীজাতি সৎ-শিক্ষায় পারদর্শিনী হইলে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ দৃষ্টি প্রসারিত হইবে তাঁহারা সন্তানের হিতাহিত নিৰ্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হইয়া সন্তানদিগকে তদনুযায়ী গঠিত করিতে পারিবেন।

প্রত্যেক জননী স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে সুগঠিত করিতে পারিলেই সমাজকে সুগঠিত করা হইবে, কারণ সমষ্টি গত মানবের সম্মিলনেই সমাজ গঠিত হয়। সুতরাং প্রত্যেক মানবের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি অনিবার্য্য এই উন্নতি কল্পে স্ত্রীজাতিই বিশেষ সহায়। অতএব স্ত্রীজাতির দায়িত্ব বড় সহজ নহে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীজাতির উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতির ধর্ম্মজীবন উজ্জ্বলীকৃত হইলেই প্রত্যেক মানবের ধর্ম্ম জীবন মাজ্জিত হইবে।

মানব-সমাজে ভগবানের বহুবিধ মূর্ত্তি কল্পিত হইয়াছে। ভগবানের চিণ্ময় মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে সকলের সামর্থে কুলাইবে না এই জন্যই ঋষিগণ নানারূপ মূর্ত্তি পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন কিন্তু ভগবানের যতই মূর্ত্তি কল্পিত হউক তাহার মূল সূত্র সেই একমাত্র চিণ্ময় ব্রহ্ম। যেমন একজন রাজাকেই আমরা বহুরূপে দেখিতে পাই রাজা যখন রাজকার্য্য করিতে থাকেন, তখন তাঁহার মূর্ত্তি একরূপ, আবার যখন তিনি বন্ধু মণ্ডলে পরিবেষ্টিত হইয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতে থাকেন তখন আর তাঁহাকে দণ্ড মুণ্ড কর্ত্তা বিশাল প্রতাপান্বিত নরপতি বলিয়া অনুমিত হয় না, তখন তিনি একজন স্নেহময় সখা মাত্র। আবার যখন তাঁহাকে জনক জননীর শ্রীচরণ তলে উপবিষ্ট দেখিতে পাই তখন কোথায় বা তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভাব কোথায় বা তাঁহার রহস্যময় চটুল সখ্যমূর্ত্তি! তখন তিনি একজন বিনম্র মানব

শিশু মাত্র। তাঁহাকেই যখন আমরা অন্তঃপুর মধ্যে প্রিয়-তমা মহিষীর বাহু বন্ধনের মধ্যে দেখিতে পাই, তখন তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য ভাব চিত্তাকর্ষক বিনম্রতা চটুল সখ্যমূর্ত্তি কিছুই দেখিতে পাই না যেন ইনি তিনি নহেন, তখন তিনি রসময় প্রেমময় রূপে বিরাজিত। তবেই দেখ একজন নৃপতিকে আমরা কতরূপে দেখিতে পাইলাম নৃপতি একজন কিন্তু তাঁহার বহুমূর্ত্তি। মঙ্গলময় পরমে-শ্বরের পক্ষেও ঠিক এই নিয়ম খাটে। প্রত্যেক মানব প্রকৃতি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত সেই অগণ্য প্রকৃতিকে সন্তোষ করিবার জন্য তিনিও মানবের নিকট অগণ্য মূর্ত্তিতে তাঁহাদেরই রুচি অনুযায়ী প্রকাশমান হন। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন :—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং।
মমাবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ॥
গীতা—৪—১১।

অর্থাৎ আমাকে যে, যেরূপে ভজনা করে আমি তাহাকে সেইরূপ প্রতিভজন করিয়া থাকি। সুতরাং আর্য্য সমাজে ভগবানের যে সকল রূপ বর্ণিত আছে তন্মধ্যে কোনটীই কল্পনাসম্ভূত নহে সমস্তই সেই এক সৎ বস্তু বিনিঃসৃত। যাঁহার যতটুকু অধিকার তিনি ততটুকু গ্রহণ করিতে সমর্থ এই মাত্র প্রভেদ। ভগবান মঙ্গলময় জীবের

মঙ্গল সাধনের জন্য তিনি বিরাট অনন্ত হইয়াও শান্তমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জীবের সমক্ষে প্রকাশমান হন। জীব সেই শান্ত মূর্ত্তি সাধন করিতে করিতে ক্রমে অনন্তের মহান্ মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হয়, ভগবানের সচ্চিদানন্দময় রূপ মানব কল্পনা নেত্রে দর্শন করিয়া যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় প্রতিমায় সেই সৌন্দর্য্যের কথঞ্চিৎ বিকাশ করিয়া তাঁহাকে ভক্তি করিতে শিখে। বস্তু প্রত্যক্ষীভূত হইলে মানব স্বভাবতঃই তাহাতে আকৃষ্ট হইতে পারে, এই জন্যই ঋষিগণ জন সমাজে প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা দিয়াছেন।

মানব যে মূর্ত্তি লইয়াই সাধন পথে প্রবিষ্ট হউক না কেন তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না মূল লক্ষ্য সেই সৎ বস্তুতে থাকিলেই হইল। তাহা হইলে এক দিন ধর্ম্ম-জীবনের পবিত্র বৃক্ষে মধুময় ফল ফলিবেই ফলিবে। এক দিন সেই মূল তথ্য হৃদয়ে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া সমগ্র হৃদয় প্লাবিত করিয়া মধুর লহরী বহিয়া যাইবে। ধর্ম্ম রাজ্যের চরম সীমা হইতেছে ঈশ্বরের প্রতি আত্ম সমর্পণ। কিন্তু মানুষ একদিনে সেই সীমায় উপনীত হইতে পারে না ক্রমে ক্রমে সোপানের পর সোপান অতিক্রম করিয়া তবে মানুষ সে রাজ্যে উপস্থিত হইতে পারে। সেই সোপান হইতেছে কর্ম্ম। গীতাতে কর্ম্মকেও একটা যোগ বলিয়া উক্ত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ মানুষ কর্ম্ম ব্যতীত নির্ম্মলাত্মা-

লাভ করিয়া ধর্ম্ম জীবন রক্ষা করিতে পারে না। মানুষ যে সকল কর্ম্ম করে তাহা নিষ্কাম হইলেই ভব বন্ধন খণ্ডন হইয়া অমৃতত্ব লাভ হয়। নিষ্কাম কর্ম্মাচরণ বড় সহজ ব্যাপার নহে, মানবের চিত্ত কামনাময়। সেই কামনাময় চিত্তকে একেবারে নিষ্কাম তত্ত্বে নিয়োজিত করা যাইতে পারে না সে রূপ চেষ্টা করা বাতুলের কার্য্য। সৎভাবে সকাম কর্ম্ম করিতে করিতেই নিষ্কাম কর্ম্ম-ইচ্ছা আসিয়া পড়ে। কামনা মুগ্ধ মানবগণকে লক্ষ্য করিয়া গীতা বলিয়াছেন ,--

অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্।

গীতা– ৩—১০।

এ কথার তাৎপর্য্য এই যে যিনি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ ভাবে আত্ম নির্ভর করিতে অক্ষম নিষ্কাম কর্ম্মই তাহার পক্ষে শ্রেয় জনক। আবার নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেও যিনি অপারক তিনি সৎভাবে সকাম কর্ম্ম করিয়াও ক্রমে উন্নতি লাভ করিবেন। কিন্তু অসৎ কর্ম্ম করিবেন না।

স্ত্রী-হৃদয় স্বভাবতঃ কামনাপর অতএব সৎভাবে সকাম কর্ম্ম সাধন করিতে থাকুন তাহাতেই তাঁহারা ক্রমোন্নতি লাভ করিবেন। প্রতিমা পূজা, ব্রতাদি পালন ও পরহিত প্রভৃতি করিলেই সৎভাবে সকাম কর্ম্ম সাধন করা হয়। ইহা হইতেই নিষ্কাম ক্রমে ঈশ্বরের প্রতি আত্ম-

সমর্পণ ভাব আসিয়া পড়ে। অতএব সকাম কর্ম্ম কোন মতেই উপেক্ষণীয় হইতে পারে না।

জীবের প্রতি দয়া মনুষ্যত্ব লাভের প্রকৃষ্ট উপায়। এই জন্যই বৈষ্ণব ধর্ম্মের গুরু শ্রীচৈতন্য মানবকে কেবল জীবে দয়া শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ হরিনাম বিতরণ করিতে গিয়া মাধাই কর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়া বলিয়াছিলেন। -

মেরেছ আমায় কলসির কানা।
তা ব'লে কি আর প্রেম বিলাবনা॥

কি মহান্ উন্নত হৃদয়! ভক্ত হরিদাস ঠাকুরের প্রাণ বিনাশ করিবার জন্য যবন রাজ কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া পাইক গণ প্রাণপণ শক্তিতে ঠাকুরের সুপবিত্র কমনীয় কলেবরে বেত্রাঘাত করিতে লাগিল তখন ভক্ত প্রবর হরিদাস— ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিতেছেন।—

এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥
শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

দয়া বৃত্তির সম্যক অনুশীলন না হইলে কেহ এমন সময়ে এমন কথা বলিতে পারে না, দয়া বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ কেবল অর্থ দ্বারা সাধিত হয় এরূপ নহে। এই বৃত্তি

বিকাশ পক্ষে অর্থ অনেকটা সাহায্য করে সত্য কিন্তু সেবাপরতাই এই বৃত্তি বিকাশের মুখ্য উপায়।

অনেকের মতে আহারের সহিত ধর্ম্মপ্রাণতার কোন সম্বন্ধ নাই কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। আহারের সহিত ধর্ম্ম জীবনের সম্বন্ধ অতি নৈকট্য। মানুষের তিনটী গুণ আছে যথা সত্বঃ, রজঃ, তমঃ। আহার হইতে এই ত্রিবিধ গুণের উৎপত্তি হয়, যিনি সাত্বিক আহার গ্রহণ করেন তাহার সত্বগুণের বিকাশ হয়, যিনি রাজসিক দ্রব্য আহার করেন তিনি রজোগুণসম্পন্ন হন তামসিক আহারীয় ব্যক্তি-গণ তম গুণান্বিত হইয়া থাকেন। এই ত্রিবিধ গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের কার্য্যাদিও তিনটী ভাবে বিভক্ত করিতে পারা যায় যথা,—সত্বঃ, রজঃ, তমঃ। যশ, মান, অর্থ প্রভৃতির প্রতি কোন রূপ আকাঙ্ক্ষা না রাখিয়া পরের হিতার্থে জগতের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ করাই সাত্বিক কর্ম্ম। ধন, মান, যশ প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষায় যে সকল কর্ম্মানুষ্ঠিত হয় তাহা রাজসিক কর্ম্ম। পরের অনিষ্ট করিয়া নিজের স্বার্থ সাধনের জন্য যে সকল কার্য্য করা হয় তাহা তামসিক কর্ম্ম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। স্বত্ব গুণী ব্যক্তিগণ ইচ্ছা না করিলেও বিনা চেষ্টায় বিনা আয়াসে লোক চিত্তাকর্ষণ করিয়া জগতে পূজার্হ হইয়া থাকেন; রজোগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিগণ চেষ্টা ও অর্থাদি ব্যয় করিয়া জনসমাজে সুনাম ক্রয় করিয়া থাকেন। তমোগুণী ব্যক্তিগণ জগতে ঘৃণার পাত্র।

তবেই দেখা যাইতেছে স্বত্বগুণী ব্যক্তির আসনই সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত হইয়াছে। এই যে স্বত্বগুণী ব্যক্তি এতটা উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়াছেন আবার তমোগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এতটা অবনতি ঘটিয়াছে ইহার অনেকটা কারণ আহার।

কোনরূপ গুরুপাক দ্রব্য আহার করিলে সহজে জীর্ণ হয় না অনেকে তাহা আদৌ জীর্ণ করিতে পারেন না ক্রমে সেই অজীর্ণতা বশতঃ ব্যাধির সৃষ্টি হয় আবার স্বাস্থ্যের সহিত মানব প্রকৃতির এত নিকট সম্বন্ধ যে যখন শরীর যে অবস্থায় থাকে প্রকৃতিও তখন সেই অবস্থায় থাকে। তৎ-কালে যে সকল কার্য্যানুষ্ঠিত হয় তাহাও অসৎ হইয়া পড়ে। তবেই দেখা যাইতেছে এই অসৎ কার্য্যের অনেকটা কারণ আহারীয় বস্তু। আবার আহারীয় বস্তু সকলের নানাবিধ গুণ আছে অর্থাৎ স্নিগ্ধ, উগ্র, কটু, কষায় প্রভৃতি। সেই সকল গুণ মানব প্রকৃতিতে মিলিত হইয়া আপনাপন ক্রিয়া করিয়া থাকে। যে বস্তুর যেরূপ গুণ সে বস্তুর কার্য্যও তদ্রূপ হইয়া থাকে। সেই ক্রিয়া সকল হইতে সত্বঃ, রজঃ, তমঃ এই ত্রিবিধ গুণের উৎপন্ন হয়। এই জন্যই আহার সম্বন্ধে স্বতঃই সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য বিশেষতঃ স্ত্রীজাতির পক্ষে। স্ত্রীজাতি তমোভাবাপন্ন হইলে সংসার কেবল তাণ্ডব নৃত্যে পরিপূর্ণ হইবে। সমাজে যাহাতে সত্ব গুণের বহুল বিকাশ হয় তাহা করিতে চেষ্টা করা স্ত্রীজাতির উচিত। আমাদের সমাজের বিধবাগণ বহু পরিমাণে

সাত্বিক আহার গ্রহণ করেন এজন্য তাঁহাদের ধর্ম্ম-জীবনও বহু পরিমাণে মার্জ্জিত।

সকল দিক চাহিয়া কার্য্য করা গৃহিণীর উচিত। সংসারে কেহ অনাদৃতা হইলে তাহার অভিসম্পাতেগৃহস্থ ন্যায়তঃ বিনষ্ট হয়। গৃহে যাহাতে সমদর্শিতার অভাব না ঘটে গৃহিণী তৎসম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন তাহা হইলে তাঁহার সংসার ক্রমশঃ ধর্ম্ম রাজ্যের প্রতি আকর্ষিত হইবে। গৃহস্থাশ্রম মানবের পক্ষে কঠোর সংগ্রাম স্থল। এই কঠোর সংগ্রাম ক্ষেত্রে যিনি জয়ী হইতে পারেন তিনি পরলোকেও জয়লাভ করেন। কিন্তু এখানে যাঁহার পদস্খলন ঘটে তিনি ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকেই যন্ত্রণাভোগ করিয়া থাকেন। হিন্দু শাস্ত্র বলেন।---

যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥

মনু - ৩—৭৭।

অর্থাৎ প্রাণবায়ুর সংযোগে যেমন সর্ব্ব প্রাণি বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হয় তদ্রূপ গৃহস্থাশ্রমের সাহায্যে সর্ব্ববিধ আশ্রমবাসিগণ জীবিকার্জ্জন দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকেন। তবেই দেখা যাইতেছে গৃহস্থাশ্রম মুখের কথা নহে স্বেচ্ছা চারিতার লীলাভূমি নহে। আত্মত্যাগ ও কঠোর সংযম এখানে একান্তই প্রয়োজনীয় বস্তু। বিশাল বিশ্বে

আপনাকে মিশাইয়া দিয়া সকলকে আপনার ভাবিয়া সকলের প্রতি যথা কর্ত্তব্য সাধন করাই ধর্ম্ম জীবন রক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। গার্হস্থ্য জীবনে ইহাই নারী জাতির কর্ত্তব্য।

কেহ শত্রুতা করিলে তাহার প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা দমন করাই মনুষ্যত্ব। প্রকৃতপক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় মানুষ মানুষের শত্রু নহে। মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বলকারী কবিবর নবীন সেন গাহিয়াছেন।—

শত্রু! এক ভগবান, সর্ব্বদেহে অধিষ্ঠান,
সর্ব্বময় এক অদ্বিতীয়।
কেবা তুমি কেবা আমি, কেবা শত্রু মিত্র কেবা
কারে বল প্রিয় বা অপ্রিয়!

কুরুক্ষেত্র।

বস্তুতঃ সেই বিরাট পুরুষ সর্ব্বভূতে অবস্থান করিতেছেন, এ বিশাল বিশ্ব তাঁহারই রূপান্তর সুতরাং এখানে শত্রু মিত্র ভাব সম্ভবে না। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ই মানুষের মূল শত্রু, ইন্দ্রিয় সমূহের বশবর্ত্তী হইয়াই মানুষ শত্রু মিত্র সৃষ্টি করে, ইন্দ্রিয় সকলকে আয়ত্বাধীন করিতে পারিলে এ ভাব তিরোহিত হইয়া ধর্ম্মজীবন উজ্জ্বল হয়। অগ্রে সাধনা তবে সিদ্ধি।

জন্ম মৃত্যু বিবাহ হিন্দুর সমস্তই ধর্ম্মমূলক। সকল কার্য্যের সহিতই মানবের ধর্ম্ম-জীবনের উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করিতেছে। অতএব ধর্ম্ম প্রাণতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রত্যেক কার্য্য করা মানবের উচিত। যিনি যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন, তিনি প্রকৃত সনাতন ধর্ম্ম পালন করিয়া জগতে স্বর্গের প্রতিচ্ছায়া দর্শন করিতে সমর্থ হন। এরূপ রমণী সংসর্গে সংসার ধন্য, স্বামী পুত্র পবিত্র, পিতা মাতা গৌরবান্বিত এবং বসুমতী কৃতার্থ হন।

জাতীয় উন্নতি।

মানব-প্রকৃতি যতই উন্নতাবস্থা প্রাপ্ত হয়, সমাজ ও সংসার ততই উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। সমষ্টিগত মানবের সম্মিলনে সমাজ গঠিত হয়; সুতরাং ব্যক্তিগত উন্নতি হইলেই সামাজিক অবস্থা অবশ্যই উন্নত হয় এবং সামাজিক অবস্থোন্নতির সহিত জাতীয় উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। জাতীয় উন্নতি একদিনে সাধিত হয় না, বহু যত্নে বহু আয়াসে তবে জাতীয় উন্নতি লাভ হইতে পারে। আপনার স্বার্থ, আপনার সুখ বিসর্জ্জন দিয়া দুই বাহু প্রসারণ করিয়া

জাতীয়-বৃন্দকে আহ্বান পূর্ব্বক স্নেহের কোমল ক্রোড়ে টানিয়া লইয়া প্রাণপণ শক্তিতে কর্ত্তব্য ক্ষেত্রে খাটিতে হইবে, তবেই জাতীয় উন্নতি লাভ হইবে। জাতীয় উন্নতি ব্যতীত সমাজের সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হয় না, সামাজিক ধর্ম্ম মার্জ্জিত হয় না; অতএব জাতীয় উন্নতিসাধন করিতে চেষ্টা করা গৃহস্থাশ্রমবাসিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য। কারণ সমাজের ইষ্টানিষ্টের সহিত তাঁহারা অত্যন্ত জড়িত। "আমি ক্ষুদ্র, আমার দ্বারা কোন কার্য্য হইতে পারে না, যাঁহার কার্য্য তিনি করিয়া লইবেন" এরূপ মনে করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা মানুষের উচিত নহে। যাঁহার কার্য্য তিনি করিবেন সত্য; কিন্তু দাস থাকিতে প্রভু খাটিবেন কেন? সেই বিশ্বপিতা জগতের পতি, সকলেই তাঁহার দাসানুদাস, তাঁহার কার্য্য তিনি সমাধা করিয়া লইবেন কিন্তু তোমাদের দ্বারা। যে আভ্যন্তরিক বৃত্তি দ্বারা জীব কার্য্যক্ষেত্রে পরিচালিত হয়, তাহা তাঁহারই প্রত্যাদেশ। তাঁহার নিকট ছোট বড় ভেদ নাই, তাঁহার কার্য্য করিবার অধিকার সকলেরই আছে। ক্ষুদ্র কাষ্ঠ বিড়ালও যখন সাগর বন্ধন কালে শ্রীরামচন্দ্রের সাহায্য করিতে পারিয়াছিল, তখন বুদ্ধিজীবী মানবের উৎসাহ উদ্যম বৃথা হইবে কেন? মানুষ চেষ্টা করিলেই জগতের জন্য খাটিতে পারে।

জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে মাতৃ ভাষার অনুশীলন প্রয়োজন। মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত

জাতীয় উন্নতি সম্ভবপর নহে। ভাষার উন্নতির সহিত জাতীয় উন্নতির এত নৈকট্য সম্বন্ধ কেন, জাতির সহিত ভাষার এমত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ কেন, এক্ষণে এক বার তাহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

মানুষের জাতি কি? এক একটী লোক লইয়া সমষ্টি রূপে জাতি গঠিত হয়। কি স্ত্রী, কি পুরুষ প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি বা অবনতির উপর সমগ্র জাতীয় উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে। বিন্দু বিন্দু জলকণা লইয়া মহাসমুদ্র হয়। সমুদ্রের জলরাশি লবণময়, তাহার প্রত্যেক বিন্দুই লবণাক্ত। প্রত্যেক ব্যষ্টিবিন্দুর যে গুণ, সমগ্র জল-রাশিরও সেই গুণ। মানব জাতিরও দোষ গুণ বুঝিতে হইলে প্রত্যেক মানুষকে বুঝিতে হয়। দেহ ও আত্মা লইয়া মানুষ। আত্মার স্বরূপ ও অবস্থা লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে, এ স্থলে তাহার আলোচনা অনাবশ্যক। এখানে যে আভ্যন্তরিক শক্তি বা গুণ বিশেষের বলে আমি আমার অস্তিত্ব অনুভব করি, যে শক্তি বলে আমার রূপ, রস, গন্ধ শব্দ স্পর্শজ্ঞান লাভ হয়, যে অন্তর্নিহিত শক্তি-প্রভাবে "আমি করি, আমি বুঝি" এইরূপ ধারণা জন্মায়, তাহাকেই আত্মা নামে অভিহিত করিব। হস্ত পদাদি লইয়া যেমন দেহ, মানসিক ভাব ও বৃত্তিনিচয় লইয়া তেমনি আত্মা। এই বাহ্য দেহ ও আত্মার গুণাবলি লইয়া মানুষ। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে দেহ ও আত্মা উভয়েরই

অনুশীলন করা প্রয়োজন। দৈহিক উন্নতিসাধন করিতে হইলে যাহাতে দীর্ঘ জীবন, বলিষ্ঠ ও নীরোগ শরীর লাভ করিতে পারা যায়, তাহার উপায় করিতে হইবে।

মানসিক ভাব ও বৃত্তিনিচয় লইয়া আত্মা তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেই ভাব ও বৃত্তিগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে গেলে ধর্ম্ম, শিল্প, দর্শন, রাজনীতি, পারিবারিক নীতি, জীবিকান্বেষণ, বৃত্তি বা অর্জ্জন স্পৃহা প্রভৃতি পাওয়া যায়; কাম ক্রোধাদি বৃত্তিও এই মানসিক বৃত্তির অন্তর্গত। আভ্যন্তরিণ উন্নতি করিতে হইলে এই সকলের সমুচিত অনুশীলন করিতে হইবে। সকল উন্নত ও সভ্য জাতির মধ্যে ধর্ম্ম, শিল্প ও দর্শন শাস্ত্রের সবিশেষ আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

সৃষ্টি, স্রষ্টা ও সৃষ্ট বস্তুর স্বরূপ এবং সম্বন্ধ নির্ণয় ও তাহার প্রকৃত জ্ঞান লইয়া দর্শন। দর্শনেরই ক্রম বিকাশে কবিতা-চিত্রাদি শিল্পের জন্ম এবং দর্শন ও শিল্পের সহিত ভগবদ্ভক্তি মিশ্রিত হইয়া ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে দর্শন শিল্প ও ধর্ম্ম এই তিনই এক মূল ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। কবিতা ও চিত্রাদি শিল্পে এবং ধর্ম্মে যে মধুর রস টুকু থাকে, তাহা শুকাইয়া শুষ্কজ্ঞানে অথবা ভাবে পরিণত হইলেই উহা দর্শনে পরিণত হইল বলা যাইতে পারে।

সভ্য সমাজে অযৌক্তিক ধর্ম্ম আদৌ টিকিতে পারে না

এবং অযৌক্তিক ধর্ম্মের সাহায্যে জাতীয় উন্নতি হয় না, এই জন্যই দর্শনের দৃঢ় ভিত্তির উপর ধর্ম্মের আসন সংস্থাপিত করা উচিত।

কবিতাদি শিল্পের অনুশীলনে মানসিক বৃত্তি নিচয়ের সম্যক স্ফূর্ত্তি ও উন্নতি জন্মে। কবির কাব্যে দেখিতে পাই, কাম ক্রোধাদির উত্তেজনায় মানুষ অধোগতির পথে কতদূর নীচতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং পক্ষান্তরে করুণা, ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি সদ্বৃত্তির সহায়তায় উন্নতির সৌধ-সোপানে কতদুর আরোহণ করিয়াছে। কবিতায় যাহা হয়, চিত্রেও তাহাই হয়। মনের ক্লেদ দূর করিয়া তাহাকে মার্জ্জিত ও বিশুদ্ধ করা কেবল কবিতাদি শিল্পেরই কার্য্য। মানব মনের এক দিকে রাগ দ্বেষাদি, পক্ষান্তরে সাহস ভীরুতাদি সমস্তই কবির কাব্যে বিকসিত এবং চিত্রকরের চিত্রে প্রতিফলিত হয়।

তাহার পর রাজনীতি ও পারিবারিক নীতির কথা। রাজনীতি ও পারিবারিক নীতির উন্নতি ব্যতীত কখনও জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। রাজনীতি ও পারিবারিক নীতি উভয়েরই মূল সূত্র আজ্ঞানুবর্ত্তিতা বা বশবর্ত্তিতা। পরিবারে পিতা বা স্বামী কর্ত্তা, পরিবার তাহার আজ্ঞায় চালিত ও শাসিত; রাজ্যের শাসয়িতা ও আজ্ঞাদাতা রাজা। পরিবারে যে বন্ধন তাহা আদিম ও প্রকৃত, রাজ্যে যে বন্ধন তাহা আরও প্রসারিত। এই যে বশবর্ত্তিতা বা

আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, ইহার মূল যেরূপ হইবে, সমাজের অবস্থাও তদনুরূপ হইবে। যেখানে এই বশবর্ত্তিতা কেবল ভয় হইতে উৎপন্ন বা স্বার্থ হইতে অভিজাত, তথায় জাতীয় উন্নতি সাধিত হওয়া দুরূহ। পক্ষান্তরে যে সমাজের বশবর্ত্তিতা কর্ত্তব্য জ্ঞান ও নিঃস্বার্থপরতা হইতে উদ্ভূত হয়, তথায় রাজ্যে অথবা পরিবারে সুখের অমৃতস্রোত বহিয়া যায়। সুতরাং বশবর্ত্তিতা বা আজ্ঞানুবর্ত্তিতা জাতীয় উন্নতির সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। শেষ জীবিকান্বেষণ বৃত্তির কথা। মনুষ্যের খাদ্য ও পরিধেয় স্বতঃই প্রয়োজন। এই উপায় নানা সমাজে নানাবিধ। অতি পূর্ব্বকালে মানুষ যখন নিতান্ত অসভ্যাবস্থায় ছিল, তখন বন্য পশু-মাংসে উদরপূর্ত্তি এবং বৃক্ষের বল্কলে লজ্জা নিবারণ করিত। (অনেক অসভ্য দেশে এখনও সে নীতি চলিতেছে।) ক্রমে এক দিকে কৃষিবাণিজ্যাদি,অপর দিকে দস্যুতা, পর-পীড়ন, পরাপহরণ প্রভৃতি উপায়ের আবিষ্কার হইয়াছে। যে জাতির জীবিকার্জ্জন প্রণালী যতই উন্নত, সে জাতি ও সমাজ ততই উন্নত ইহাই আমরা দেখিতে পাই। সুতরাং এই জীবিকান্বেষণ উপায়ের উন্নতি বা অবনতির উপরেও জাতীয় উন্নতি নির্ভর করিতেছে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি জাতীয় উন্নতিসাধন করিতে হইলে, নীরোগ শরীর ও দীর্ঘজীবন প্রয়োজন ; কিন্তু তাহার উপায় কি ? আমাদের রাজা ইংরাজজাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে

দেখিতে পাই, তাঁহাদের শারীরিক অবস্থা আমাদের অপেক্ষা বহু উন্নত। আমাদের পশ্চিমোত্তর অঞ্চল পঞ্জাব এবং আফগানিস্থান প্রভৃতি প্রদেশবাসিগণের সহিত তুলনাতেও আমরা আমাদের শারীরিক হীনাবস্থা বিলক্ষণরূপে উপলব্ধি করিতে পারি, এরূপ বৈষম্যের নিশ্চয়ই কারণ আছে। খাদ্য-পানীয়াদি নির্ব্বাচন গুণে অথবা ব্যবহারের প্রকারভেদে দৈহিক স্বাস্থ্যের উন্নতি বা অবনতি ঘটিয়া থাকে। পুষ্টিকর পরিমিত খাদ্য,নির্ম্মল পানীয় এবং বিশুদ্ধ বায়ু এই তিনটি স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান উপাদান। আমাদের দেশীয় স্বাস্থ্যের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে বোধ হয় আমাদের ঐ প্রয়োজনীয় তিনটী বস্তুরই অভাব ঘটিয়াছে। সেই অভাব নিরাকরণ করিতে পারিলেই আমরা স্বাস্থ্যোন্নতি লাভ করিতে পারিব। এই নিরাকরণ কার্য্যে ভাষার অনুশীলন সমধিক প্রয়োজন।

আমরা বুদ্ধিশালী জীব, বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা আমাদের অভাব সকল পূরণ করিয়া লইতে হইবে। আমরা প্রধানতঃ ভূয়োদর্শন দ্বারাই বুঝিতে পারি, কোন্‌টা উপকারী কোন্‌টা অপকারী। ভাষার সৃষ্টি হওয়ায় আমাদের সেই ভূয়োদর্শন জ্ঞান আয়ত্ব করিবার আরও সুবিধা হইয়াছে। ভাষার অনুশীলনেই এক যুগের জ্ঞান, অন্যযুগে, এক দেশের জ্ঞান অন্য দেশে, এক ব্যক্তির ভূয়োদর্শন অন্য ব্যক্তিতে প্রসারিত হইয়া উঠে। দুঃখের বিষয়

বঙ্গভাষায় স্বাস্থ্যবিদ্যা আলোচনার একান্তই অভাব; এখন চরক সুশ্রুতাদির দোহাই দিয়া আর আমাদের চলে না। সংস্কৃত ভাষার যুগ নাই, দেশ কাল বুঝিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া উচিত, এখন জাতীয় উন্নতির পক্ষে বঙ্গ-ভাষাই প্রধান সহায়। এখন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বঙ্গভাষার পাঠক। সুতরাং বঙ্গভাষায় স্বাস্থ্যতত্ত্ব আলোচিত হইলে, তাহা প্রত্যেক মানবে সম্প্রসারিত হইয়া সমাজে ইষ্টোৎ-পাদন করিবে; কিন্তু সে সম্বন্ধে সকলেই উদাসীন। এত দিন আমাদের দেশে ডাক্তারী চিকিৎসা প্রচলন হইয়াছে কিন্তু এতাবৎ বঙ্গভাষায় কয়খানি পুস্তক প্রকাশ হইয়াছে? যাহা হইয়াছে তাহার ভাষা ও ভঙ্গি এমনই ভয়ানক যে, পড়িতে গিয়া হতবুদ্ধি হইতে হয়। দুই একটী ক্রিয়াপদ ভিন্ন সমস্তই ইংরাজি; কেবল ইংরাজি শব্দগুলি বাঙ্গালা ভাষায় মুদ্রিত মাত্র। স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান না জন্মিলে, রোগাদি আক্রমণের হাত হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবে? ম্যালেরিয়ায় দেশ উৎসন্ন গেল, অথচ ম্যালেরিয়া জিনিষটী কি, তাহা কয়জন লোক বুঝেন? পানীয় জলের অপরিশুদ্ধতা যে ওলাউঠার কারণ, তাহা অনেকে বুঝিয়াও তাহা শোধন করিতে কয়জন লোক যত্ন করিয়া থাকেন? আমাদের দেশে যে এত ব্যাধি ও অকালমৃত্যুর প্রাদুর্ভাব হইয়াছে,স্বাস্থ্যতত্ত্বালোচনার অভাবই তাহার প্রধান কারণ। ইংরাজদের দেশে পুস্তকে, প্রবন্ধে, সংবাদ ও সাময়িক

পত্রিকাদিতে সততই উহার আলোচনা চলিতেছে। তাহার ফলে তথাকার অধিবাসীগণ স্বাস্থ্যসুখে একান্ত সুখী হইয়া জাতীয় উন্নতিপথে শনৈঃশনৈঃ ধাবিত হইতেছেন। আর আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, স্বাস্থ্যতত্ত্বালোচনার মুখপাত্র ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্তের "স্বাস্থ্য", মৃতকল্প— সুদক্ষ কবিরাজ ৺রামচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ সম্পাদিত "ঋষি" পত্রিকা খানি অকালেমৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। ধন্য বঙ্গদেশ! ধন্য বাঙ্গালী! স্বাস্থ্যতত্ত্বে এইরূপ উদাসীন থাকিলে বঙ্গদেশ অচিরে মহাশ্মশানে পরিণত হইবে। দেশে যাহাতে সমধিক স্বাস্থ্যতত্ত্বালোচনা হইয়া, তাহা নারীজাতিতে সম্প্রসারিত হইয়া, তাহারা গৃহচিকিৎসায় পারদর্শিনী ও সংসারে নীরোগতা সংস্থাপিত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। দেশীয় ভাষা উন্নত না হইলে কেন জাতীয় উন্নতি হইবে না, তাহা আমরা এতক্ষণে বেশ বুঝিতে পারিতেছি। দেশের অধিকাংশ লোকেই ইংরাজি বা সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী নহেন, বিদেশীয় ভাষালব্ধ-জ্ঞান কেবল শিক্ষিত কয়েক ব্যক্তিতেই আবদ্ধ; কিন্তু মাতৃভাষায় যে সকল বিষয় আলোচিত হয়, তাহার ফল বহুদূর বিস্তৃত এবং তাহা ধনী নির্ধন সকলের মধ্যেই আপনা হইতে প্রসারিত হইয়া উঠে।

ভাষার প্রথমাবস্থায় অন্য ভাষা হইতে পুস্তকাদি অনূদিত হইয়া, প্রকাশ না হইলে ভাষার পুষ্টিসাধন হয় না।

জগতে কোন সভ্যজাতীয় ভাষায় এমন কোন উত্তম পুস্তক নাই, যাহা ইংরাজিতে অনূদিত না হইয়াছে! কি কাব্যাদি কলাশাস্ত্র, কি সংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্র, কি আয়ুর্ব্বেদাদি চিকিৎসা শাস্ত্র, আমাদের সমস্ত উৎকৃষ্ট সংস্কৃত পুস্তকই ইংরাজি ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বঙ্গভাষার বয়ঃক্রম এখনও শতবর্ষ অতিক্রম করে নাই, এখন অন্য ভাষা হইতে পুস্তকাদি ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিলে নিশ্চয়ই ভাষার পুষ্টি ও দেশের হিতসাধন হইয়া জাতীয় উন্নতি লাভ হয়।

নারীজাতি সমাজের পৃষ্ঠপোষক। তাহাদিগকে অশিক্ষিতা করিয়া রাখিলে সমাজের প্রভূত অনিষ্টসাধন হয়; সুতরাং সম্যকরূপে জাতীয় উন্নতি লাভ হইতে পারে না। এমতে বঙ্গভাষার উন্নতি হইলে অল্পায়াসেই নারী-জাতি উন্নতি লাভ করিয়া সমাজোন্নতি কল্পে যোগদান করিতে পারিবেন। নারীজাতির উন্নতিতেই জাতীয় উন্নতি অনিবার্য্য।

বিবাহ পদ্ধতি।

মানুষ যত দিন পর্য্যন্ত বিবাহিত না হয়, ততদিন তিনি গৃহী নামে অভিহিত হন না। সে তাবৎ কি স্ত্রী কি পুরুষ কোন পক্ষেরই গার্হস্থ্য ধর্ম্মে অধিকার জন্মায় না।

বিবাহ-বন্ধনের সহিত মানবের সুখ শান্তি, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতির ঘনীভূত সম্বন্ধ। এই জন্যই হিন্দু বিবাহকালে দেবাদি অর্চ্চনা পূর্ব্বক সংযত চিত্ত হয়েন। হিন্দু শাস্ত্রে বিবাহ আট প্রকার। যথা :—

ব্রহ্মো দৈবস্তথৈবার্ষঃ প্রাজাপত্যস্তথাসুরঃ।
গন্ধর্ব্বো রাক্ষসশ্চৈব পৈশাচশ্চাষ্ট মোহধমঃ॥

মনু—৩—২১।

এই আট প্রকার বিবাহের মধ্যে অধুনা সভ্য সমাজে ব্রাহ্ম বিবাহই বহু পরিমাণে প্রচলিত। ব্রাহ্ম বিবাহের লক্ষণ শাস্ত্রমতে এইরূপ :—

আচ্ছাদ্য চার্চ্চয়িত্বাচ শ্রুতশীলবতে স্বয়ং।
আহূয় দানং কন্যায়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥

মনু—৩—২৭।

অর্থাৎ কন্যার পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি অভিভাবকগণ অন্বেষণ পূর্ব্বক পাত্র মনোনীত করিয়া বর ও কন্যাকে অর্থ

অলঙ্কার প্রভৃতি যৌতুক প্রদান করিয়া কন্যা সম্প্রদান করেন। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, শাস্ত্রে বর-যৌতুকপ্রথা রহিয়াছে; কিন্তু অধুনা অনেক স্থলে বর-যৌতুক বড়ই যন্ত্রণাদায়ক হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে কন্যা-কর্ত্তা ইচ্ছা ও অবস্থামত বর-যৌতুক দিতেন, এখনও কন্যা-কর্ত্তা সাধ্যমত বর-যৌতুক প্রদান করিতে অবশ্যই ত্রুটি করিবেন না; কিন্তু সে কথা কে শোনে! আজকাল কন্যা-কর্ত্তাকে পীড়ন করিয়া বরকর্ত্তা টাকা আদায় করেন। বরের দর যেন নিলামের দর। আবার যাঁহার পুত্র যত বেশী পাশ করিয়াছেন, তাঁহার পিতার মেজাজ ততই ভারি, তাঁহার ফর্দ্দের ঘটা দেখে কে! এই জন্যই দুঃখ করিয়া কোন লোক বলিয়াছেন:—

"না হ'তে এণ্ট্রান্স পাশ, চায় রুপার থাল গেলাস
এলে হ'লে আঁচল পাতে বি এয় করে সর্ব্বনাশ।"

কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। সমাজের এই অবস্থা দেখিয়া শুনিয়াই কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় "লোভেন্দ্র গবেন্দ্রের"* সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আবার একজন লিখিয়াছেন:—

"বল্লালি বাধা কুল, প্রায় হ'ল নির্ম্মূল,
বিশ্ববিদ্যালয় স্কুল সুরু যে হ'তে।
এণ্ট্রান্স এক পেশে, এলে দো পেশে,
বি এ তেপেশে মান্য ভারতে।

* কবিবর রাজকৃষ্ণ রায় লিখিত লোভেন্দ্র গবেন্দ্র দ্রষ্টব্য।

বল্লভী সর্ব্বানন্দ, ফুলে খড়দহ হয় না সন্ধ,
পাশ করা ছেলে পছন্দ সকল মেলেতে,
সম্বন্ধ না হ'তে, বরের মুরুব্বিতে
লম্বা ফর্দ্দ দেন হাতে নবাবী মতে।
পাকা বাড়ী মার্ব্বেল ম্যাজ, দরোয়ানের রূপার ব্যাজ
হিরার আংটী সোণার ল্যাজ ঝুল্‌বে পশ্চাতে
চার পেশের কর্ত্তাপক্ষ, ঠিক যেন সর্ব্বভক্ষ্য
যার ছেলে গণ্ড মূর্খ সে মরে দুঃখেতে।"

কিন্তু এত ঠাট্টা বিদ্রূপেও বঙ্গ জাগিল কৈ। সাধে কি রবীন্দ্র নাথ গাহিয়াছেন"তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে" বস্তুতঃ সভ্য সমাজে এখন মাতৃদায় পিতৃদায় অপেক্ষা কন্যা দায়ই বিষম হইয়া উঠিয়াছে। যিনি নিরন্ন অন্ততঃ পক্ষে তাঁহারও কন্যার বিবাহ ৫০০ শত টাকার কমে হইবে না। অনেক স্থলে বাস্তু ভিটা পর্য্যন্ত বন্ধক দিয়াও কন্যা বিবাহের ব্যয় সঙ্কুলান হইয়া উঠে না। কি ভয়াবহ অবস্থা, স্মরণ করিলেও হৃদয় কণ্টকিত হইয়া উঠে। এই জন্যই কন্যা জন্ম-মাত্র মাতা পিতার হৃদয়ে কেমন একটা বিষাদের ছায়া পড়িয়া যায়। নব প্রসূতা কন্যা বাঁচিবে কি মরিবে তাহার ঠিক নাই; কিন্তু এখন হইতেই বিবাহব্যয়-ভীতি আসিয়া মাতা পিতার হৃদয় ঘিরিয়া ফেলে। এই সর্ব্বনাশক বিবাহ পণের জন্যই পূর্ব্বে রাজপুতানায় কন্যা হত্যা হইত, জানিনা ভারতের ভাগ্যে কি আছে!

এই যে বিবাহপণ এতাধিক বৃদ্ধি হইয়া জনসাধারণকে পীড়ন করিতেছে ইহার মূল স্ত্রী জাতির হীন প্রকৃতি। পুত্রের বিবাহের সময় গৃহিণী যে ফর্দ্দ কর্ত্তার নিকট দাখিল করেন, কর্ত্তা, কন্যা কর্ত্তার নিকট তাহাই পেস করেন। ইহার প্রত্যব্যয়ে গৃহিণী উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন। আমরা প্রায়ই দেখিতে পাই কন্যাকর্ত্তা অলঙ্কার প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যাদি উপঢৌকন প্রদান করেন, তাহা সহজে কিছুই গৃহিণীর মনোনীত হয় না, তিনি মুখ ফিরাইয়া বসেন, কুটুম্বের প্রতি নানারূপ কটূক্তি করিতেও বিরত হন না। গৃহিণীর আকাঙ্ক্ষা পুত্রের বিবাহ দিয়া তিনি একটা জায়গীরদার হইয়া বসিবেন; কিন্তু তাহা হয় না। কাজেই কুটুম্বের প্রতি তাঁহার বিরক্তি আসিয়া পড়ে, ক্রমে সেই বিতৃষ্ণা বধূর উপর সঞ্চারিত হইয়া নানারূপ অশান্তিতে সংসার দগ্ধ হইয়া যায়। পবিত্র রূপে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালনের ত্রুটি ঘটে। এমতে আমাদের বিবেচনায় বরপণাধিক্যে নারী জাতির সমধিক গৌরব হ্রাস হইতেছে। এই তীব্র বরপণ-প্রথা তাঁহাদেরই হৃদয় হীনতার অন্যতম পরিচয়। প্রত্যেক রমণী যদি তাঁহাদের এই অকিঞ্চিৎকর অর্থলালসা দমিত করিয়া বরপণ-প্রথা নিবারণ করিবার জন্য স্ব স্ব স্বামীকে উত্তেজিত করেন, তবে অচিরেই সমাজের এই অশান্তি তিরোহিত হইতে পারে। এই অত্যধিক বরপণ হইতে গার্হস্থ্য ধর্ম্মও কলুষিত হইতেছে। কারণ

অনেক স্থলে কন্যা বয়স্থা হইয়া পড়ে, তথাচ কন্যাকর্ত্তার বরপণ সংগ্রহ হইয়া উঠে না। ইহাতে নানাপ্রকার অশান্তির কারণ হয়।

অনেকের মতে পতি-পত্নী পরস্পরে নির্ব্বাচন করিয়া লইলে জীবন সুখের হয় কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ঠিক বলিয়া অনুমিত হয় না। কারণ সে সময় স্ত্রী বা পুরুষের মনোবৃত্তি বড়ই উত্তেজিত হয়, সে সময় তাঁহাদের দ্বারা নিরপেক্ষ নির্ব্বাচন হইতে পারে কি না সন্দেহ।

যৌবনের ভালবাসা কেবল চোখের, অন্তরের নহে। ইংলণ্ডের মহাকবি সেক্সপিয়র তাহার কোন সুললিত কবিতায় ঐরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন *। যেখানে ভালবাসা চোখের সেখানে কেবল প্রবৃত্তির মাদকতা উন্মত্ততা; সুতরাং সে পদ্ধতি সুখদায়ক বলিয়া বোধ হয় না। যদি তাহা হইত, তবে বাল্যবিবাহিতা ভ্রমরকে বঙ্কিম বাবু কদাচ আদর্শ রমণী রূপে সৃষ্টি করিতেন না। †

কেহ কেহ বলেন প্রাচীন হিন্দু সমাজে নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলিত ছিল; অথচ দেখা যায় সেই দম্পতি নিরতিশয় সুখে জীবন যাপন করিয়াছেন।

ক্বচিৎ রাজবংশে কন্যা স্বয়ম্বরা হইতেন সত্য কিন্তু বর্ত্তমান

* "Young men's love then lies not truly in their heart but in their eyes."

† বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণকান্তের উইল দ্রষ্টব্য।

নির্ব্বাচন প্রথা হইতে সেই স্বয়ম্বর পদ্ধতি বহু ব্যবধান। কন্যা যাঁহাকে মনোনীত করিতেন, তাঁহাকে যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিলে তবেই তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করা হইত। নচেৎ কন্যার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। শণিকোপতাড়িত রাজ্যভ্রষ্ট শ্রীবৎস রাজাকে ভদ্রাদেবী বরমাল্য প্রদান করিয়া পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সাবিত্রীর পিতা অশ্বপতিও এক সময় দুহিতাকে বলিয়া ছিলেন,—

"প্রার্থিতঃ পুরুষো যশ্চ সনিবেদ্য স্বয়া মম।
বিমৃষ্যাহং প্রদাস্যামি বরয় ত্বং যথোপ্সিতম্॥"

তাৎপর্য্য এই যে, তুমি এক্ষণে পতি নির্ব্বাচন কর এবং যাহাকে তোমার যোগ্য বলিয়া মনে করিবে তাঁহার কথা আমার নিকট জ্ঞাপন করিবে, উপযুক্ত বিবেচনা করিলে তাঁহার করে তোমাকে সম্প্রদান করিব।

সুতরাং এরূপ নির্ব্বাচন বিশেষ অপকারী নহে। এই ত গেল যৌবন বিবাহের কথা, পক্ষান্তরে বাল্যবিবাহও সমাজে দারুণ অশান্তি উৎপাদন করে। দরিদ্রতা, স্বাস্থ্য ভগ্ন, বাল-বৈধব্য এ সমস্ত যে বাল্যবিবাহের বিষময় ফল তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না, এমতে কোন্ বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত তাহাও কিঞ্চিৎ আলোচ্য।

আমাদের বিবেচনায় বাল্যবিবাহই ঠিক; কিন্তু বিবা-হের অব্যবহিত পরেই স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন প্রার্থনীয় নহে, ইহা হইতেই নানা অশান্তির সূত্রপাত হয়। বিবাহের

পর উপযুক্ত বয়স প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত দম্পতি যুগলকে বিভিন্ন করিয়া রাখা অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য, তাহা হইলে বাল্যবিবাহের বিষময় ফলের পরিবর্ত্তে অমৃতময় ফল লাভ হয়। তাহাতে পতি বা পত্নীর চিত্ত অন্যাকৃষ্ট হইতে পারে না ; আকর্ষণী শক্তি যেমন চক্ষের অন্তরালে থাকিয়া তাহার কার্য্য সাধন করে, তদ্রূপ এই দম্পতিযুগল পরস্পরে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অমূল্য দাম্পত্য প্রেম লাভ পূর্ব্বক সংসারকে স্বর্গের প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ দেখিতে সমর্থ হন। তাহাতে গার্হস্থ্যধর্ম্মের সম্পূর্ণ মঙ্গল সাধিত হয়। কিন্তু দারুণ বরপণ প্রথার জন্য এ সম্বন্ধে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে, কারণ অনেক স্থলেই পিতার বরপণ সংগ্রহ করিতে কন্যা অরক্ষণীয়া হইয়া উঠে।

দারুণ বরপণের জন্য সংসার হইতে অনেক সৎকার্য্য বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে, কারণ অনেক স্থলে যাহার পাঁচটী কন্যা আছে, বরপণ সংগ্রহার্থে তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়, অন্যরূপ সৎকার্য্যে কিছু ব্যয় করা তাহার পক্ষে বড়ই কঠিন। সুতরাং বরপণের জন্য দরিদ্র ও অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যা করা এক প্রকার দুরূহ। দারুণ বরপণ-প্রথার জন্য সমাজে অনিষ্টের ইয়ত্তা নাই। বরপণ নিবারিত হইয়া যাহাতে পাত্র সুলভ হইয়া কন্যা বিবাহের দুরূহতা বিদূরিত হয়, তদ্বিষয়ে স্বীয় স্বীয় স্বামী পুত্রকে উত্তেজিত করা রমণী জাতির অবশ্য কর্ত্তব্য।

দম্পতী ধর্ম্ম।

মানুষ শৈশবে মাতা পিতার অধীনে থাকে এবং সেই সময় তাহাদের জীবনোপযোগী সকল শিক্ষা পিতা মাতা শিক্ষক প্রভৃতি তাহাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। তাহারা তৎকালে সেই শিক্ষা সকলের অনুধ্যান ও গুরুজন-বর্গের অধীনতাকেই পরম সুখময় মনে করিয়া থাকে। জননীর অঞ্চল, পিতার স্নেহ-সম্ভাষণই তাহাদের জীবনের সার বস্তু। যতই তাহাদের জ্ঞানোন্মেষ হয়, তাহারা ততই সুখের কল্পনা করে; তাই বালিকারা মৃণ্ময় পুত্র কন্যা প্রভৃতি লইয়া একটা সংসার গঠিত করে, ক্রমে জননীর অঞ্চল, পিতার প্রীতি চুম্বনও আর তাহাদিগকে সমধিক প্রীতি প্রদান করিতে পারেনা, তাহাদের প্রাণ যেন আরও কিছু চায়, তাহারা মৃণ্ময় সংসারে যে খেলা খেলিয়াছে, এখন বাস্তবজীবনে তাহা আস্বাদন করিবার বাসনা জন্মে। এই বাসনা মাত্র যখন ধুমাইত হয়, হিন্দু সমাজে তখন তাহাদের জনক জননী বা উপযুক্ত অভিভাবকগণ তাহাদিগকে বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ করেন। অনেকের মতে কন্যাকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখিলে এই ধুমাইত বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া সমাজকে দগ্ধ করিয়া ফেলে

বিবাহের পর মানুষের নূতন জীবন আরম্ভ হয়। যে হৃদয়ে এত দিন মাতা পিতার আসন মাত্র স্থাপিত ছিল, আজ তাহাতে আর এক জন দেখা দিয়াছেন। সকল মূর্ত্তি আচ্ছাদন করিয়া এই নবাগন্তুকের মূর্ত্তিতে হৃদয় পরিপূর্ণ, সমগ্র জীবন দোদুল্যমান! পিতা মাতার নিকট প্রাণ খুলিয়া কথা কহিতে যখন সঙ্কোচ আরম্ভ হইল, তখন এই নবীন মূর্ত্তিটী আসিয়া হৃদয় আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। ইঁহার নিকট সঙ্কোচ নাই, অন্তরের অন্তর প্রদেশ খুলিয়াও যেন তৃপ্তি নাই, একটী মাত্র হৃদয় কি বলিয়া সম্ভাষণ করিয়া পরিতৃপ্ত লাভ করিবে! বুঝি শত শত হৃদয় হইলে তবে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের তৃপ্তিসাধন হইত!

এখন হইতে মানবের দাম্পত্য ধর্ম্মের উন্মেষ। এই দাম্পত্য ধর্ম্ম সাধন করিতে করিতে মানুষ দেবত্ব লাভ করে অমৃতময় রাজ্যে উপনীত হয়। এই দাম্পত্য ধর্ম্মের চরম সীমা হইতেছে ঈশ্বরের প্রতি আত্ম সমর্পণ। দাম্পত্য প্রেমের যখন পূর্ণ বিকাশ হয়, তখন আর তাহা একটীমাত্র প্রাণীতে অবস্থান করিতে পারে না, তখন তাহা সমগ্র জগতে পরিবেষ্টিত হইয়া আরও উর্দ্ধে অর্থাৎ মঙ্গলময় পরমেশ্বর-পদে নীয়মান হয়। তখন সমগ্র জগত ব্রহ্মময় হইয়া পড়ে। দলাদলি সাম্প্রদায়িকতা কিছুই থাকে না, তখন সমগ্র জগতে সেই সচ্চিদানন্দময়ের মোহন মূর্ত্তি কেবল অনুভূত হইয়া থাকে। হৃদয় তখন রসময় গোলক

ধাম হইয়া উঠে। সেই মধুর গোলক ধামে আনন্দময় পরম পুরুষ, পুরুষ প্রকৃতিরূপে বিরাজ করিতে থাকেন। দাম্পত্য প্রেম যখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন তাহা "মধুর বা কান্তভাব" আখ্যায়িকা প্রাপ্ত হয়। এই "কান্ত বা মধুর ভাবই" অতীন্দ্রিয় রাজ্যের শেষ প্রদেশ। কিন্তু মানুষ একদিনে এই মহাভাব-রাজ্যে উপনীত হইতে পারে না, বহুজন্মের বহু সাধনা বল থাকিলে তবে মানুষের এই মধুর প্রদেশে গতি হইতে পারে। মানবের সকাম বৃত্তিই সে রাজ্যের সোপান "ধনং দেহী পুত্রং দেহী ভাগ্যং দেহী মে ভগবতী" বলিয়াই মানুষ এক দিন

"আমি কেবল চাই তোমারে,
চাহিনা ধন রত্ন রাশি।"

বলিতে শিখে। প্রথমে আমরা এখানে পিতা মাতার দ্বারা দাস্যভক্তি শিক্ষা করিয়া তবে ভগবানে ভক্তি অর্পণ করিতে অভ্যস্থ হই। মানবের মধ্যে দাম্পত্য প্রেমের ব্যবস্থা না থাকিলে ভগবানের মধুর ভাব আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইত না। যাহা ধারণায় কুলায় না, মানুষ তাহাতে উপনীত হইতে পারে না। পুত্র হীন ব্যক্তি বাৎসল্য রস উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না, কতকটা অনুভব করিতে পারে মাত্র; কিন্তু অনুভব ও উপভোগ বহু ব্যবধান। সেই ভাব রাজ্যের চরম সীমায় সহজে উপনীত হইবার জন্যই ঋষিগণ দাম্পত্য প্রেমের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ইহা কেবল ঐহিক

তৃপ্তি সাধন বা ইন্দ্রিয় সেবার জন্য নহে, ইহা সংসারের সুখ—জীবনের শান্তি—অতীন্দ্রিয় রাজ্যের অমৃতময় ফল। তবেই দেখ দাম্পত্য প্রেম কি মধুর কি মহান্! ইহার বিরাট ব্যাপিত্ব কতই রমণীয়!

এই দাম্পত্য প্রেমের পূর্ণ বিকাশ করিতে চেষ্টা করা কি স্ত্রী, কি পুরুষ প্রত্যেক গার্হস্থ্যাশ্রমবাসীগণের পক্ষে সমান আবশ্যক। এই বৃত্তি যাহার সম্যক পরিস্ফুরণ হয়, তিনিই যথার্থরূপে গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারেন।

এই প্রবৃত্তিকে সম্যক প্রস্ফুটিত করিতে হইলে স্থূলতঃ কয়েকটী দ্রব্যের প্রয়োজন। সে দ্রব্য কয়টী হইতেছে পতি পত্নী উভয়ের নিঃস্বার্থপরতা—পবিত্রতা—পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস—কর্ত্তব্য জ্ঞান ও দেবানুরক্তি—পরলোকের স্থায়িত্ব জ্ঞান। এই ছয়টী জ্ঞান বলবৎ রাখিয়া কার্য্য করিলে তবেই প্রকৃতরূপে দম্পতী-ধর্ম্ম রক্ষা হয়। দম্পতী-ধর্ম্ম রক্ষণার্থ শাস্ত্রকার রমণীদিগকে বলিয়াছেন :—

পতি প্রিয় হিতে স্থিতা স্বাচারা সংযতেন্দ্রিয়া।
ইহ কীর্ত্তিমবাপ্নোতি প্রেত্য চানু পরমং সুখং॥

যাজ্ঞবল্ক্য।

অর্থাৎ যে নারী পতির প্রিয় ও মঙ্গল কার্য্যে আত্ম বলি প্রদান করেন ও সদাচারিণী এবং সংযতেন্দ্রিয়া হয়েন, তিনিই ইহলোকে অতুল কীর্ত্তি, পরলোকে পরম সুখলাভ করেন।

স্ত্রীদিগকে যেমন পতির প্রতি অনুরক্ত হইতে বলিয়াছেন, তদ্রূপ পুরুষদিগকেও "ভার্য্যা ভর্ত্তা তথৈবচ" বলিয়াছেন। দম্পতীধর্ম্ম লাভ করিতে হইলে উভয়ের সমচিত্ততার প্রয়োজন। পতি পত্নীর দুইটী হৃদয় একতা সূত্রে আবদ্ধ না হইলে সাংসারিক সুখ দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়ে, জীবন বিষময় হয়, দম্পতীধর্ম্ম রক্ষা হয় না ; অতএব পতি পত্নী এক চিত্ত হইতে সর্ব্বথা যত্ন করিবেন।

এক চিত্ততা সাধন করিতে করিতে একাগ্রতা আইসে। একাগ্রতা হইতে তন্ময়ত্ব উপস্থিত হয়। তন্ময়ত্ব লাভ হইলেই পবিত্র দাম্পত্য ধর্ম্মের মধ্যে ভগবানের মধুর মূর্ত্তি প্রকটিত দেখিতে পাওয়া যায়। *

দম্পতীধর্ম্ম প্রতিপালনই দেবত্বের বিকাশ। যিনি সংসারে থাকিয়া স্বর্গসুখ লাভ করিতে চাহেন, তিনি প্রকৃতরূপে দম্পতী ধর্ম্মানুশীলন করুন। স্ত্রৈণতা দাম্পত্য ধর্ম্মের ফল নহে। অসীম কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ঐশীশক্তি বিকাশই দাম্পত্য ধর্ম্মের মুখ্যফল। স্ত্রৈণতা দাম্পত্যধর্ম্মের কলঙ্ক কারণ তাহাতে কর্ত্তব্য বন্ধনের শৈথিল্য ঘটে। যেখানে কর্ত্তব্য বন্ধন শিথিল, সেখানে দম্পতীধর্ম্ম নাই। সেখানকার ভালবাসা আবিলতাময় মোহ। স্ত্রৈণতা অজ্ঞানতা হইতে সঞ্জাত দম্পতী ধর্ম্মের ফল পরাজ্ঞান।

---

* God is love, and he that dwelleth in love, dwelleth in god, and god in him. John.

শিক্ষকতা ও আচার্য্যতা।

যাহার নিকট হইতে কোনরূপ শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহাকেই গুরুনামে অভিহিত করা যাইতে পারে। তন্মধ্যে পিতা মাতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা সংসারাশ্রমে প্রধান গুরু। ইঁহাদের স্নেহ, যত্ন, ভালবাসা প্রভৃতিই আমাদিগকে মনুষ্য নামের যোগ্য করিয়া তুলে।

পিতামহ, মাতামহ, মাতুল, দিদি, খুড়ি, জ্যেঠী প্রভৃতি সকলেই আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের এক একটি উপাদান; সুতরাং সকলেই আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী। পিতা মাতা প্রভৃতির স্নেহ যত্ন সত্বেও মানুষের আর এক জন গুরুর প্রয়োজন হয়। সেই গুরুর সাহায্য ব্যতীত সম্যকরূপ মনুষ্যত্ব স্ফূর্ত্তি হয় না। এই জন্য পিতা মাতা বা অভিভাবকগণ প্রাণপণ যত্ন পূর্ব্বক সন্তানের জন্যে আর একটী গুরু নির্ব্বাচন করিয়া দেন। এই গুরু জনসমাজে শিক্ষক নামে অভিহিত হন। পিতা মাতা ও উপযুক্ত অভিভাবকগণ সন্তানকে ইঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন। সেই অবোধ অপোগণ্ড শিশুগণ কিরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিবে, কিরূপে তাহারা পণ্ডিত ও বিদ্বান

সমাজে আদৃত হইবে, কিরূপে তাহারা নির্ম্মল চরিত্র লাভ করিয়া জগতের আদর্শ স্থানীয় হইবে, ইনি সেই চেষ্টাতেই বিভোর। সেই কার্য্য সাধনের জন্যই ইঁহার সমস্ত জীবন মন উৎসর্গীকৃত। পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গের স্নেহ মমতা যে জ্ঞানবত্তা প্রদান করিতে অসমর্থ, শিক্ষক মহাশয় অনায়াসে সেই অমূল্য জ্ঞান সকল মানব হৃদয়ে চিত্রিত করিয়া দিয়া সংসারে অনন্ত শান্তির স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেন। এই জন্যই শিক্ষক ব্যতীত আমাদের একপদও চলে না, শিক্ষকহীন শিক্ষা আমাদের পক্ষে সম্ভবে না। আমাদের শিক্ষা যেরূপভাবে নিয়ন্ত্রিত হইবে, জীবনও সেই অনুযায়ী গঠিত হইবে। ছাত্রের হিতার্থে শিক্ষকের হৃদয় উৎসর্গ করাই জাতীয় উন্নতি—স্বদেশোন্নতি—সমাজোন্নতি—ধর্ম্মোন্নতি প্রভৃতির সোপান। বর্ত্তমান কালের সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে বোধ হয়, শিক্ষকগণ যেন কিয়ৎপরিমাণে তাহাদিগের দায়িত্ব বিস্মৃত হইয়াছেন। আধুনিক শিক্ষায় যেন বহু পরিমাণে কার্য্যকারিতার অভাব ঘটিয়াছে বোধ হয়। এখনকার শিক্ষায় কেবল শিক্ষক ও ছাত্র উভয়ের মাত্র অর্থ অর্জ্জনস্পৃহা বর্ত্তমান। আধুনিক শিক্ষা কেবল অর্থের জন্যেই অনুষ্ঠিত।

আমাদের বর্ত্তমান আদর্শ ইংলণ্ড—আমরা তাহার অনুকরণ করিয়া এমন অসার হইয়া পড়িতেছি এমন কথা

বলা যায় না। কারণ ইংলণ্ডে প্রকৃতই বিশেষ বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় সকল রহিয়াছে যাহা প্রকৃতরূপ অনুশীলিত হইলে ভারতের ভাগ্যে এক সুমহান গৌরব সূচিত হইবে।

ইংলণ্ডের স্বাস্থ্যতত্ত্বে মনোনিবেশ, কার্য্যতৎপরতা, কর্ম্মনিষ্ঠতা, একাগ্রতা, জাতীয় একতা প্রভৃতি গুণাবলী প্রকৃতই গৌরবকর। কিন্তু অধুনা আমরা সেই সকল বিষয়ের কিছুই শিক্ষা পাইতেছি না বরং দেশীয় যাহা কিছু ছিল তাহাও ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। আমরা কেবল ইংলণ্ডের ঘৃণাত্যক্ত রীতি নীতি গুলি শিক্ষা করিয়া সমাজে অশান্তির বিষ উদ্গীরণ করিতেছি। এই ভাব যে কেবল মাত্র পুরুষ জাতিতে সম্প্রসারিত হইয়া নিরস্ত হইয়াছে, তাহা নহে; সমাজের মূল ভিত্তি নারীজাতির হৃদয় পর্য্যন্ত এই বিকৃতভাবে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কন্যাকে বিদ্যা শিক্ষায় পারদর্শিনী করিবার জন্য অধুনা অনেকেই কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অনেকস্থলে পুরুষজাতির ন্যায় তাহাদিগকেও অর্থকরী বিদ্যায় পারদর্শিণী করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু স্ত্রীজাতির শিক্ষা কেবল অর্জ্জন-স্পৃহায় পর্য্যবসিত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। পুরুষ অপেক্ষাও স্ত্রীজাতির শিক্ষা দেওয়া বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ। এখানকার শিক্ষক সমধিক ধর্ম্মপরায়ণ ও আত্মসংযমী হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু ঠিক তাহা হয় না; এই জন্যই

আধুনিক নারী জাতি শিক্ষিতা হইয়াও অধিকাংশ স্থলেই সম্যকরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে পারিতেছেন না।

আমরা এখন দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতিলাভ করিতেছি সত্য; কিন্তু সেই উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম প্রাণতা বলি দিতেছি। স্বীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে অনুরাগ রাখিয়া যদি শিক্ষা-ক্ষেত্রে জীবন পরিচালিত করা হয়, তবে আমরা প্রকৃতই উন্নতির সৌধ সোপানে আরোহণ করিতে পারি। প্রাচীন আর্য্যগণ ধর্ম্মপ্রাণতা বলেই কি দর্শন কি বিজ্ঞান কি সাংসারিক কি সামাজিক সর্ব্ববিধ জ্ঞানই আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা দর্শন বিজ্ঞানের সুরম্য রাজ্যে এতাদৃশ প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন যে,তাহা চিন্তা করিলে আধুনিক মহামহোপাধ্যায় বৈজ্ঞানিকগণেরও মস্তিষ্ক ঘুরিয়া যায়। যতদিন আমরা নিজ ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিব,ততদিন আমাদের জাতীয় গৌরব-পতাকা কোনরূপে উড্ডীয়মান হইবে না। আমাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে মানবের যাহা যাহা প্রয়োজন তৎসমুদয়ই নিহিত আছে। সম্যক্‌রূপে ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচিত হইলেই মানুষ আপনার এবং সামাজিক হিতাহিত নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়। হিতাহিত বিচার করিয়া কার্য্য করিতে না পারিলে জীবন যন্ত্রণাময় হয়, এই জন্যই কি স্ত্রী কি পুরুষ নিজ নিজ ধর্ম্মশাস্ত্র অনুশীলন সকলের পক্ষেই সমান কর্ত্তব্য।

পুরুষ বহু পরিমাণে স্বেচ্ছাচারী; সেই স্বেচ্ছাচারী জাতিকে সংযত করিয়া কর্ত্তব্য ক্ষেত্রে জীবন উৎসর্গ করিতে নারীজাতিই শিক্ষা দেন। রমণী পুরুষের জীবনের শান্তি, নিরাশার আশা, ভগ্নোদ্যমে উৎসাহ, ধর্ম্মরাজ্যের সহযাত্রী। মহম্মদ যদি খাদিজাকে পত্নী রূপে না পাইতেন, তবে আজ মহম্মদের পবিত্র নাম জগতে প্রোথিত হইত কিনা সন্দেহ। স্ত্রী জাতির উন্নতিতে যখন পুরুষের উন্নতি অনিবার্য্য, তখন স্ত্রী-শিক্ষকদিগকে অতি সন্তর্পণে কায্য-ক্ষেত্রে জীবন পরিচালিত করিতে হইবে। যে শিক্ষক মানবের সমগ্র বৃত্তিগুলি সম্যক প্রস্ফুটিত করিবার পক্ষে বিশেষ সহায় তাঁহার কার্য্য যে কতদূর গুরুতর তাহা স্মরণ করিয়া কার্য্য করা উচিত—এ সম্বন্ধেও সমাজপতিগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া প্রয়োজন। অধুনা অনেক স্থলে স্ত্রীজাতি বিদ্যা শিক্ষা করিয়া পুরুষের সমকক্ষ হইয়া বসেন; সেই সকল স্ত্রীলোককে দেখিয়া অনেকে বলেন, "শিক্ষায় স্ত্রীজাতির প্রয়োজন নাই। তাহারা খাটিবে খাইবে, পর-করুণাপ্রত্যাশিনী হইয়া জীবন যাপন করিবে,তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য এই মাত্র।" প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে—অশিক্ষিতা রমণীগণ সংসারের কণ্টকস্বরূপা, তাহাদের দ্বারা জগতের অথবা সমাজের কোন কার্য্য সুসাধিত হয় না, পরন্তু বহু অনিষ্টপাত হয়। বঙ্গনারীর চরিত্র বর্ণন করিতে গিয়া বিখ্যাত কবি ৺হেম বাবু একস্থলে বলিয়াছেন;—

অহঙ্কারে ফেটে পড়ে, চ'লে যান ধেয়ে—
হায় হায় ওই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে।
মুখের সাপটে দড় বিপদে অজ্ঞান,
কোঁদলে ঝড়ের আগে, কথায় তুফান।
বেহদ্দ সুখের সাধ, পা ছড়ায়ে বসা—
* * * * *
পেটি ভরা কুঁজড়ো কথা পর নিন্দা গ্লানি।
* * * * *
যার খায় যার পরে তারি নিন্দাবাদ।

হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী।

এই কয় চরণে অশিক্ষিতা নারী চরিত্র উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। তবেই দেখ অশিক্ষিতা রমণী জগতে কি যন্ত্রণাদায়ক! অতএব নারীজাতির শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজন। হিন্দু-শাস্ত্রকারের শীর্ষ স্থানীয় মহাত্মা মনু প্রত্যেক পিতাকে নিজ নিজ কন্যাকে শিক্ষা দিবার জন্য আদেশ করিয়াছেন। কিন্তু এ কথা স্মরণ করিতে অনেকেই বিস্মৃত হন।

আবার হিন্দু সমাজে যাহারা কন্যাকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন, তাহারা বড় জোর একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত কন্যাকে শিক্ষকের সংশ্রবে থাকিতে দেন। এবং বিদ্যালয় ত্যাগের সহিত তাহাদের শিক্ষাদির সমাপ্তি হয়। তাঁহাদেয় অভিভাবকগণ মনে করেন ইহাই যথেষ্ট, সুতরাং বালিকারাও বিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক

কতকগুলি নাটক নভেল পড়িয়া ক্রমে আপনাদিগকে নভেলী নায়িকার অনুকরণে গঠিত করিয়া সংসারে তীব্র অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

স্ত্রীজাতির সৎশিক্ষার অভাবই সমাজে নানারূপ অশান্তির কারণ। বাল্যকাল হইতেই তাহাদের শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। বাল্যকালে মানুষ যে শিক্ষা পায় তাহা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। অতএব এই সময় হইতে তাহাদিগকে যথোচিতরূপে নীতিশিক্ষা প্রদান করিতে পারিলে তাহাদিগের চিত্ত বিকৃতভাবাপন্ন হইবার সম্ভাবনা অতি বিরল।

বাল্যকালই শিক্ষার উপযোগী কাল, তবে বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার আলোচনা থাকা আবশ্যক, তবেই জ্ঞান যথার্থরূপ প্রসারিত হয়। নারীজাতি যখন গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রধান সহায়, তখন তাঁহাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে চলিবে না।

এ সম্বন্ধে সমাজ অবশ্য সহায়তা করিবেন কিন্তু স্ত্রী জাতির আন্তরিক যত্ন ও আগ্রহের প্রয়োজন।

কোনও কবি গাহিয়াছেন,—

"না জাগিলে যত ভারত-ললনা
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা"

বর্ত্তমান সময়ে এই কথাটী সম্পূর্ণ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

শিক্ষক ব্যতীত মানবের আরও একজন গুরু আছেন,

ইনি শাস্ত্র সমূহে আচার্য্য নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। শিক্ষক ব্যতীত যেমন সাধারণ জ্ঞান সকল সহজে আয়ত্ত হয় না, তদ্রূপ আচার্য্য ব্যতীত অধ্যাত্ম-জ্ঞান প্রস্ফুটিত হয় না। সাধারণ জ্ঞানের সহিত অধ্যাত্মজ্ঞান বিকসিত হইলে মণিকাঞ্চনের যোগ হয়, মানব-জীবন মধুময় হয়। অধ্যাত্ম-জ্ঞানশূন্য যে জ্ঞান তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে, তাহা গোটাকত জানা কথার পুনরাবৃত্তি মাত্র। এই জন্যই সকল সম্প্রদায়েই এমন কি সুসভ্য ইংরাজজাতির মধ্যেও আচার্য্য গ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে। যাঁহার অধ্যাত্মজ্ঞান যতই উন্নত, সমাজে তিনিই তত নমস্য এবং সমাজাদির হিতাহিত নির্দ্ধারণ করিবার ক্ষমতা তাঁহার ততই প্রসারিত। অতএব নারী জাতির অধ্যাত্মজ্ঞান সম্যক বিকসিত হইলে সংসার ও সমাজের অবস্থাও উন্নত হইবে। আচার্য্যই যখন এ অমূল্য জ্ঞান প্রদাতা, তখন নারীজাতির পক্ষে আচার্য্য গ্রহণ অবশ্যই কর্ত্তব্য। হিন্দু সমাজের নারীগণ সাধারণতঃ আচার্য্য গ্রহণ করিয়াও থাকেন; কিন্তু অধ্যাত্মচর্চ্চায় আধুনিক রমণীগণ বড়ই উদাসীন। আধুনিক আচার্য্যগণের মধ্যে তাঁহাদের জ্ঞানবত্তা বিকসিত করিবার জন্যে অনেকেই যত্নবান নহেন। আধুনিক আচার্য্যদিগের মধ্যে অনেকেই দীক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত হন; কিন্তু ইহা আচার্য্যের কর্ত্তব্য নহে, শিষ্যের প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক ব্যবহার প্রতি পদবিক্ষেপে আচার্য্যকে লক্ষ্য

রাখিতে হইবে এবং গুরুকে তদনুযায়ী কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। তবেই শিষ্য-চরিত্র গঠিত হইবে, তবেই শিষ্য প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভ করিয়া গুরুর গৌরব বর্দ্ধিত করিয়া ক্ষুদ্র সংসারটীকে স্বর্গে পরিণত ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মরূপ বৃক্ষে মধুময় ফল ফলাইয়া সমাজকে ও জগৎকে কৃতার্থ করিতে পারিবে।

নারী-হৃদয় স্বভাবতঃ ভক্তিপ্রবণ, তাহাতে তাহাদিগে শিক্ষার প্রতি আচার্য্যগণ নিজ দায়িত্ব স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিলে নারীজাতি অবশ্যই উন্নতিলাভ করিবে, সমাজের আবর্জ্জনা রাশি বিদূরিত হইবে। শিক্ষক এবং আচার্য্য দ্বারা মানুষ উন্নতির চরম সীমায় সমাসীন হয়; এমতে শিক্ষকতা ও আচার্য্যতা কেবল অর্থকরী সম্বন্ধ নহে। এ সম্বন্ধ বড়ই গাঢ়তর, তাঁহাদের কার্য্য সমধিক দায়িত্বপূর্ণ। শিক্ষক এবং আচার্য্যদিগকে তাহা স্মরণ করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। তবেই ভারতের ভাগ্যে আবার গৌরব সূর্য্য উদিত হইবে, তবেই মহীয়সী রমণী রত্নকে বক্ষে ধারণ করিয়া ভারত ধন্য হইবে।

সাহিত্য ও গার্হস্থ্য ধর্ম্ম।

সাহিত্যের সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সম্বন্ধ অতি সংশ্লিষ্ট। শিক্ষকের গুণাগুণে যেমন মানব-চরিত্রের উন্নতি বা অবনতি ঘটে, সাহিত্যের অনুশীলনেও মানব সমাজে তদ্রূপ ফল হয়। বরং সাহিত্যের ভাব, সাহিত্যের ভাষা, সাহিত্যের কার্য্য, শরীরী গুরু অপেক্ষাও মানবের উপর প্রভুত্ব করে। আমরা সাহিত্যে যাহা পাঠ করি, হৃদয়ে তাহা প্রোথিত হইয়া যায়।

আমরা কুরুরাজ দুর্য্যোধনকে কখনও দেখি নাই, কিন্তু সাহিত্যের ভাষা আমাদের চক্ষের উপর তাঁহাকে এমনি ভাবে সাজাইয়া আনে যে, আমরা তাঁহাকে প্রলোভনের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিরূপে দেখিতে পাইয়া প্রলোভনের বিষময় ফল অনুধাবন পূর্ব্বক তাহার নিকট হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিতে সমর্থ হই। আবার কবি-গুরু বাল্মীকি শ্রীরামচন্দ্রের মনোন্মাদক মূর্ত্তি ভাষা দ্বারা এমন সুন্দর ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, শ্রীরামচন্দ্রের অনিন্দ্য দেবমূর্ত্তি আমাদের নয়ন পথে সুস্পষ্ট রূপে প্রতীয়মান হইয়া তদীয় পবিত্র চরণে আত্ম সমর্পণ করিবার জন্য মধুর

আহ্বান করিতেছেন। সাহিত্যের অনুশীলনেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের ধর্ম্মপ্রাণতা, বীরবর বৃকোদরের তেজস্বীতা, অর্জ্জুনের কর্ত্তব্য জ্ঞান চক্ষের উপর প্রতিভাত দেখিতে পাই। সাহিত্যের অনুশীলনেই আমরা সীতা, সাবিত্রী ও শকুন্তলা প্রভৃতি দেবীগণকে চিনিতে সমর্থ হই, এবং তাঁহাদের পবিত্র চরিত্র অনুকরণের প্রয়াস পাই। সাহিত্যই আমাদিগকে বালক ধ্রুবের তপশ্চর্য্যা—প্রহ্লাদের ভগবদ্ভক্তি দর্শন করাইয়া বিমুগ্ধ করিতেছে। আর সেই দর্শনই যে আমাদের সাহিত্যানুশীলনের মুখ্য ফল তাহা নহে, সেই চিত্রসকল আমাদের হৃদয়ে প্রগাঢ়রূপে প্রতিবিম্বিত হইয়া তাহা মানব প্রকৃতির উপর ক্রিয়া করিয়া থাকে, ইহাই সাহিত্যানুশীলনের মুখ্য ফল। এই জন্যই সাহিত্যের উন্নতি বা অবনতির সহিত মানবীয় উন্নতি বা অবনতি নির্ভর করে—এই জন্যই সাহিত্যের সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম্মের প্রগাঢ় সম্বন্ধ।

অধুনা সাহিত্যের বড়ই অবনতি ঘটিতেছে; ইহার অবনতির সহিত আমাদেরও সমূহ ক্ষতি হইতেছে। অধুনা বঙ্গসাহিত্যের সমধিক চর্চ্চা হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহার উন্নতিকল্পে কাহারও বড় একটা দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না। আজ কাল দুই পাত লেখা পড়া শিখিয়াই গ্রন্থকার গ্রন্থকর্ত্রী অথবা সম্পাদক সম্পাদিকা হইবার বাসনা সকলকারই বলবৎ হইয়া উঠে। এমন কি মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র,

মহাকাব্য প্রণেতা নবীন সেন, কবিবর, হেমচন্দ্র, মাতৃভূমির বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণকে তাঁহাদের আসন হইতে বিচ্যুত করিয়া সেই আসন দখল করিয়া বসিবার জন্য অনেকেই লালায়িত। তাই আমরা মাতৃভূমির লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের কোন্ থানে কোন্ ত্রুটি হইয়াছে তাহারই অন্বেষণ করিয়া বেড়াই। নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীর গ্রহণ করিতে আমরা জানি না—পারি না। অন্যের দোষ প্রতিপন্ন করিতে পারিলেই যেন আমরা কৃতার্থ হই। কিন্তু ইহাতে উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতিই সম্ভব। যাঁহাদের ভাস্বতী কীর্ত্তিকলাপ বঙ্গ সাহিত্যকে আলোকিত করিয়া রখিয়াছে, সেই কীর্ত্তিরাশিকে বিলুপ্ত করিতে তোমার ক্ষমতা কোথায়? যদি প্রকৃতই কীর্ত্তিলাভ করিতে চাও, যদি সত্যই বঙ্গভাষাকে অমূল্য রত্ন দ্বারা সজ্জিত করিবার বাসনা থাকে, সাধনা কর সিদ্ধ হইবে। মৌলিকতার প্রতি দৃষ্টি রাখ তবেই তোমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে। চর্ব্বিত চর্ব্বণে উপকার অপেক্ষা অপকারই অধিক হয়। একটা কথায় বলে "সাত নকলে আসল নষ্ট" এ কথা স্মরণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও, তবেই বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন হইয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সহায়তা করিবে।

অধুনা অনেকেই গ্রন্থ লেখেন এবং কোন গতিকে লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখকগণের নিকট হইতে কয়েকখানি প্রশংসা

পত্র সংগ্রহ করিয়া স্বীয় পুস্তকের সহিত তাহা যোজনা করিয়া দিয়া নিজ গৌরব প্রোথিত করিবার চেষ্টা করেন। পাঠকগণও সেই প্রশংসা পত্র দৃষ্টে এতই বিমুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, তাঁহাদের আর স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা থাকে না। তাঁহারাও প্রশংসা পত্র প্রদাতার সহিত এক মত হইয়া কেবল "কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ" বলিয়া যান। আবার সকল সাময়িক বা সংবাদ পত্রের সম্পাদকগণও যে, নিরপেক্ষ বিচার করেন তাহা নহে; সম্পাদকগণের মধ্যে কেহ অর্থের কেহ কুটুম্বিতার অথবা বন্ধুত্বের কিম্বা কোনরূপ স্বার্থের খাতিরে পুস্তক না পড়িয়াই পূর্ব্ববৎ "কেয়াবাতেরই" অনুসরণ করিয়া যান, আবার গ্রন্থ-প্রণেতার সহিত কোনরূপ মনোমালিন্য থাকিলে সম্পাদক বা বিচারকগণ সেই দাদ তুলিবার জন্য প্রকৃত প্রশংসার্হ গ্রন্থকে নিকৃষ্ট করিয়া পাঠকবর্গের চিত্তে বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকেন; সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁহাদের যে গভীর দায়িত্ব আছে তাহা তাঁহারা বিস্মৃত হন। এই সকল নানা কারণেই সাহিত্যের মৌলিকতা নষ্ট হইয়া কতকগুলা আবর্জ্জনা রাশিতে সাহিত্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্গদেশে "পরের মুখে ঝাল খাওয়া" লোকের সংখ্যাই অধিক। এমতে উপযুক্ত প্রশংসাপত্রের অভাবেও অনেক প্রতিভাবান লেখক বা লেখিকা সাহিত্য সমাজে উপযুক্ত আদর না পাইয়া ভগ্নমনোরথ হন ও তাঁহাদের

অমূল্য প্রতিভা রাশি বিলীন হইয়া যায়, ইহাতে মৌলিকতা নষ্ট হয়—সাহিত্যভাণ্ডারে কতকগুলি অমূল্যরত্ন লাভের ব্যাঘাত ঘটে, সুতরাং গার্হস্থ্য ধর্ম্মেরও ক্ষতি হয়।

আজ কাল সাহিত্যে বড় একটা অন্য আদর্শ নাই, কেবল প্রেমের আদর্শ। কাব্য উপন্যাস গল্প প্রহসন সমস্তই প্রণয়ে পরিপূর্ণ, যেন এটা প্রণয়যুগ। প্রকৃতপক্ষে প্রণয় যুগ হইলে ক্ষতি ছিল না, কেননা প্রণয় সমগ্র জগতের উপাস্য। প্রণয়ানুশীলনে মানুষ দেবতা হয়, কিন্তু এ প্রণয় সে প্রণয় নহে। যে প্রণয় বলে সাবিত্রী মৃত পতিকে জীবন দান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, রাজনন্দিনী জনকসুতা কাননচারিণী হইয়াছিলেন, দক্ষরাজ-দুহিতা সতী প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছিলেন, মহাদেব উন্মত্ত প্রাণে সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, ধর্ম্মবীর দুষ্মন্তরাজ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন, এ প্রণয় সে প্রণয় নহে। সে প্রণয় এবং এ প্রণয় স্বর্গ মর্ত্ত্য ব্যবধান। সে প্রেম উপাস্য, এ প্রেম ঘৃণার্হ। সে প্রেম হৃদয়ের, এ প্রেম চোখের। সে প্রেম প্রেম, এ প্রেম প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাস। সে প্রেমে মানুষ দেবতা হয়, এ প্রেমানুশীলনে মানবের জন্য নরকের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। এই প্রেমেরই এখন ছড়াছড়ি। নরনারী প্রভৃতি সকলেই এখন এই প্রেমপূর্ণ সাহিত্যের পাঠক। ইহার কুফল প্রত্যেক নরনারীতে সম্বেষ্টিত হইতেছে। সৎসঙ্গে মানব মন যেরূপ উচ্চতা এবং অসৎ-

সঙ্গে নীচতা প্রাপ্ত হয়, সৎ এবং অসৎ সাহিত্যের অনু-শীলনেও মানবের তদ্রূপ উন্নতি বা অবনতি ঘটে।

আধুনিক প্রেম শিক্ষা কেবল মাদকতার শিক্ষায় পূর্ণ। ইহার ফল মানব স্বভাবের উপর যতই প্রভুত্ব করিতেছে, আমাদের সংসার ও সমাজ ততই জ্বালাময়ী হইয়া উঠিতেছে। এ প্রেম ইন্দ্রিয়লালসার রূপান্তর সুতরাং কর্ত্তব্য জ্ঞান শূন্য।

এক্ষণে দেখিতে পাই প্রেমের জন্য অনেকে আত্মহত্যা করিতেও প্রস্তুত,—হায়! এই কি প্রেম শিক্ষা!

যেখানে ঐকান্তিক প্রেম আছে, বিরহ ঘটিলে সেখানে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইতে পারে কিন্তু আত্মহত্যার চেষ্টা আসিতে পারে না। আত্মহত্যা যদি প্রেমের ধর্ম্ম হইত—তবে কৃষ্ণময়ী রাধিকা অসহ বিরহ যন্ত্রণা সহ্য করিতেন না। আত্মহত্যায় যদি প্রেম উজ্জ্বলীকৃত হইত, তবে দুষ্মন্ত পরিত্যক্ত শকুন্তলা কখনই জীবিতা থাকিতেন না। বঙ্কিম বাবুর "ভ্রমর" সর্ব্বাগ্রেই বিষ খাইত,—আয়েষা নদীগর্ভে অঙ্গুরীয় নিক্ষেপ করিতেন না। বস্তুতঃ আত্মহত্যা প্রেমের ধর্ম্ম নহে, ইহা কামনার উত্তেজনার ফল। চরিতামৃতকার লিখিয়াছেন,—

প্রিয়া প্রিয় সঙ্গ হীনা প্রিয় প্রিয়া সঙ্গ বিনা
নাহি জীয়ে এ সত্য প্রমাণ।

মোর দশা শুনে যবে, তার এই দশা হবে,
এই ভয়ে দুঁহে রাখে প্রাণ।
সেই সতী প্রেমবতী, প্রেমবান্ সেই পতি,
বিয়োগে যে বাঞ্ছে প্রিয় হিতে।
না গণে আপন দুখ, বাঞ্ছে প্রিয়জন-সুখ,
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ইহাই প্রকৃত প্রেমের লক্ষণ। কিন্তু এখনকার সাহিত্যে এ প্রেমের ছায়া মাত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আর্য্য সাহিত্যে কি প্রেম ছিল না? ছিল, কিন্তু সে প্রণয় এ প্রণয় নহে,—যে প্রেমে মানুষ দেবতা হয়, আর্য্য সাহিত্যে সেই প্রেমেরই বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়; সে প্রেমে আত্মত্যাগ আছে—কর্ত্তব্যের শিথিলতা নাই। যখন শকুন্তলার প্রেমে দুষ্মন্ত অধীর, এক দণ্ডও শকুন্তলাকে ত্যাগ করিয়া থাকিলে যখন তাঁহার গত প্রাণ হওয়া সম্ভব, যখন তাঁহার নিকট সমস্ত জগৎ শকুন্তলাময় বোধ হইতেছিল, ঠিক সেই সময় পুত্রপিণ্ড-পালন ব্রতোপলক্ষে তাঁহাকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য তাঁহার মাতৃগণ দূত প্রেরণ করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রবর দুষ্মন্ত তখন শকুন্তলা-প্রেমে আত্মজ্ঞান রহিত হইলেও কর্ত্তব্য জ্ঞান শূন্য হন নাই, মাতৃগণের সন্তোষার্থে তিনি তদীয় প্রিয় বয়স্য মাধব্যকে মাতৃগণ সকাশে প্রেরণ করিলেন। তিনি জানিতেন মাতৃগণ মাধব্যকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন, সুতরাং তিনি না

যাইলেও মাধব্য তদীয় প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া মাতৃগণ-চিত্তে প্রীতি প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন। তিনি স্বয়ং গেলেই ভাল হইত, কিন্তু গেলেন না কেন? শকুন্তলার প্রেমাবদ্ধ হইয়া তিনি কি কর্ত্তব্য জ্ঞান ভ্রষ্ট হইলেন? না—তাহা নহে। তখন তিনি তপস্বীগণের শান্তি বিধান কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন, সে কার্য্য অন্যের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে না, কিন্তু মাতৃগণের সন্তোষ বিধান মাধব্যের দ্বারা হইতে পারে; এই জন্যই তিনি স্বয়ং না যাইয়া মাধব্যকে প্রেরণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার কর্ত্তব্য জ্ঞান দ্বিগুণতর ফুটিয়া উঠিয়াছে, তিনি প্রেমে অধীর হইয়াও সকল দিক চাহিয়া কার্য্য করিতে বিস্মৃত হন নাই। ইহাই প্রেমের গৌরব—ইহাই প্রেমের মাহাত্ম্য। প্রাচীন সাহিত্যকার এইরূপ প্রেম শিক্ষা দিয়াই সমাজে অমৃত-স্রোত বহাইয়া দিতেন।

অধুনা বঙ্গসাহিত্যের গতি যেরূপ ভাবে প্রধাবিত হইতেছে, সে স্রোত প্রশমিত না হইলে, মানবের চিত্ত কলুষিত হইয়া পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কলঙ্কিত হইয়া পড়িবে।

কথামালা শেষ হইতে না হইতেই বঙ্গনারীগণ বঙ্গভাষা পাঠ করিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহাদের জ্ঞান সম্যক্‌রূপ উন্মেষিত হয় না—বুদ্ধি মার্জ্জিত হয় না, সুতরাং নিকৃষ্ট নভেলাদি পড়িয়া তাঁহাদের রুচিদোষ ঘটে, চরিত্র বিকৃত হইয়া যায়,—সুতরাং সংসারে সুগৃহিণী ও সুমাতার

অভাব হইয়া পড়ে। সুগৃহিণী ও সুমাতা ব্যতীত সহস্র চেষ্টাতেও মানব জীবন উন্নত হইতে পারে না। যদি মানব জীবন ও গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উন্নতি করিতে হয়, তবে সাহিত্যের উন্নতিসাধন করা সর্ব্বাগ্রেই প্রয়োজন। সাহিত্য সদ্ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইলে মানব প্রকৃতিও সৎভাবে চালিত হইবে। ইহা স্থির নিশ্চয়।

টোট্‌কা ঔষধ।

গার্হস্থ্য আশ্রমে থাকিতে হইলে, সর্ব্বদা বহু আধিব্যাধি ভোগ করিতে হয়, কতকগুলি মুষ্টিযোগ জানা থাকিলে অনেক সময় বহু উপকার হয়, কথায় কথায় ডাক্তার ডাকিয়া অর্থের শ্রাদ্ধ করিতে হয় না। প্রাচীন কালের মহিলাগণ এ বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। পরম শ্রদ্ধাস্পদ ৺ রামচন্দ্র কবিরাজ তাঁহাদের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"সেকালের সব বুড়োবুড়ী, জান্‌ত এমন শেকড়-পাতা।
ষোলটাকা ভিজিট্ থেকো ডাক্তারবাবু লাগেন কোথা॥"

বাস্তবিক এ সম্বন্ধে তাঁহারা সংসারে বহু উপকার সাধন করিতেন। উক্ত কবিরাজ মহাশয় তাঁহার পিতামহীর নিকট টোট্‌কা ঔষধ শিক্ষা করিয়াই আয়ুর্ব্বেদীয় ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত

হইতে সাহস করিয়াছিলেন, তাহা আমরা তাঁহার নিজমুখে অবগত হইয়াছিলাম। মল্লিখিত নারীধর্ম্ম গ্রন্থে কতকগুলি টোট্‌কা ঔষধের উল্লেখ করিয়াছি, প্রয়োজন বোধে এ স্থলেও কতকগুলি মুষ্টিযোগ সন্নিবেশিত হইল।

১। দূর্ব্বা, লাল গাঁদাফুল, ফট্‌কিরি ভিজান জলে বাটিয়া লাগাইলে, কাটা ঘার রক্ত তদ্দণ্ডে বন্ধ হয়, ক্রমে ঘা জোড়া লাগে।

২। বংশলোচন ২ রতি, পিপুলচূর্ণ ২ রতি, গন্ধক চূর্ণ ১রতি, সোহাগার খৈ ১ রতি, আকন্দ ফুল চূর্ণ ১ রতি একত্র মধুর সহিত গুলিয়া খাইলে আল্‌জিভ্‌ বৃদ্ধির জন্ম কাশি, বায়ুজনিত কাশি, উৎকাশি ও বুকের ঘড়ঘড় যুক্ত শ্লেষ্মাপূর্ণ প্রভৃতি বহু প্রকার কাশি আরাম হয়।

৩। দুই তোলা পরিমাণ আদা ছেঁচা ও এক তোলা মিছরী, আধ পোয়া গরম জলে ফেলিয়া, (চা সিদ্ধ করার ন্যায়) সহ্য মত গরম গরম খাইলে সাধারণ সর্দ্দি কাশির পক্ষে বিশেষ উপকার হয়।

৪। সর্দ্দি বসিয়া মাথা, কপাল বা রগ দপ দপ করিয়া অত্যন্ত যন্ত্রণা হইলে, একটা পাতি লেবু বেশ করিয়া গোবর মাখাইয়া নরম আগুনে পুড়াইয়া তাহার শাঁস রগে ও কপালে লাগাইলে আশু যন্ত্রণা উপশম হইয়া সর্দ্দি বসা ভাল হয়, তিন দিন দিলে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে। প্রতিদিন রৌদ্রের সময় একবার বা দুইবার লাগাইতে হয়।

৫। ১০।১২টা দাড়িম পাতা, ৫।৬টা বেলপাতা, দুই আনা গেরিমাটী চূর্ণ জলে বাটিয়া চোখের চারিদিকে প্রলেপ দিলে, অতি শীঘ্র চক্ষু উঠা ভাল হয়।

৬। ডাবের জলে চক্ষু ধুইলে চক্ষু উঠা জনিত জ্বালা আশু নিবারণ হয়।

৭। নিমের ফুল ও কাঁচা সোহাগা হুকার জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে ছুলী ভাল হয়।

৮। হস্ত বা পদের অঙ্গুলীতে "কুনী" উঠিলে অথবা ফুলিয়া উঠিলে কিম্বা "আঙ্গুল-হাড়া" রোগ হইলে মানকচুর ডাঁটাকে ঐ অঙ্গুলী পরিমিত করিয়া কাটিয়া তাহার মধ্যস্থ শাঁস সমুদয় ফেলিয়া দিয়া অঙ্গুরীবৎ পরিধান করিলে ২।৪ দিনের মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

৯। মস্তকে উকুন জন্মিলে সোডা দিয়া মাথা ধুইলে অথবা গরম নারিকেল তৈল কর্পূর মিশ্রিত করিয়া মাথায় মাখিলে উকুন ভাল হয়।

১০। গাঁদাফুলের পাতা জলে বাটিয়া যে কোন প্রকার স্ফোটকে ৩ বার লাগাইলে ফোড়া ফাটিয়া পূঁয বাহির হইয়া যায়। ঐ পাতা গব্য ঘৃতের সহিত ফুটাইয়া যে কোন প্রকার ক্ষত স্থানে লাগাইলে শীঘ্র ঘা শুকাইয়া যায়।

১১। চক্ষে আঞ্জনী উঠিলে কচি আম পাতার জলবৎ আটা দিবসে ৪।৫ বার প্রলেপ দিলে উহা আর উঠে না।

১২। পুরাতন ইক্ষুগুড়ের সহিত কাঁচা হারিদ্রা বাটিয়া

দিবসে ২ বার খাইতে পারিলে দাস্ত পরিষ্কার হয় ও প্লীহা এবং লিভারের অনেকটা উপকার হয়।

১৩। আফুলা গোলঞ্চের শিকড়ের ছাল রবিবারে সেবন করিলে পালাজ্বর আরোগ্য হয়।

১৪। পিপুল, হরিতকী, কাঁজিতে সিদ্ধ করিয়া সৈন্ধবের সহিত সেবন করিলে মন্দাগ্নি বিদূরিত হয়, অজীর্ণ নষ্ট হয় এবং চোঁয়া ঢেঁকুর উঠিলে তাহাও বিদূরিত হয়।

১৫। দুই আনার সোহাগার খৈ চূর্ণ, এক আনার পাপড়ী খয়ের ও দুই আনা চা খড়ি চূর্ণ এই কয় দ্রব্য একত্র করিয়া আতপ তণ্ডুলের জলের সহিত ৪ রতি পরিমাণে ২।৩ দিন একবার করিয়া সেবন করিলে অরুচি রোগ সারে।

১৬। বিট্‌লবণ দুই আনা ও জাঙ্গি হরীতকী চূর্ণ দুই আনা এই দুই দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে সেবন করিলে, অতি অল্প দিনে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ আরোগ্য হয়।

১৭। কচি খর্জ্জুর পত্রের রসের সহিত কিঞ্চিৎ লবণ দিয়া সেবন করিলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

১৮। আহার করিবার অগ্রে ঘোল-দ্বারা কুলকুচা করিয়া তৎপরে আহার করিলে অরুচি নষ্ট হয়।

১৯। দুই তোলা ভাজা মুগ চারি পল জলে সিদ্ধ করিয়া এক পল থাকিতে নামাইয়া ঐ জলের সহিত ৪মাসা

দারুচিনি চূর্ণ ও ৪ মাসা খৈ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে সর্দ্দি ভাল হয়।

২০। পুরাতন গুড়ের সহিত আমলা ও ভীমরাজ চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অতি অল্প দিনে অম্লপিত্ত উপশম হয়।

২১। নাক কাণ বিন্ধাইয়া বেদনা বা ঘা হইলে, কি খোসের ঘা অথবা দীর্ঘ কালের অন্যান্য ঘা থাকিলে তিনটা রসুন ছেঁচিয়া এক ছটাক গব্য ঘৃতে ফেলিয়া অল্প জালে উক্ত ঘৃতকে বেশ চোঁয়াইয়া লইবে, রসুনগুলা যেন বেশ কাল হয়, সেই ঘৃত দিনে ৩।৪ বার ঈষদুষ্ণ করিয়া লাগাইলে ৩।৪ দিনে ঘা সারিয়া যায়।

২২। প্রত্যহ প্রাতঃকালে উৎকৃষ্ট চিনির সহিত এক ঝিনুক পেঁপের আটা সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃতের উপশম হয়।

২৩। বোল্‌তা বা মৌমাছি কামড়াইলে কাঁচা পাথুরে কয়লা ঘষিয়া দিলে তদ্দণ্ডে বিষ চলিয়া যায়।

২৪। শিঙ্গি বা মাগুর মাছের কাঁটা লাগিলে আধ পোয়া শীতল জলে এক তোলা সোরা (*) মিশাইয়া সেই জলে নেকড়া ভিজাইয়া পটী দিলে ভাল হয়।

২৫। স্তন ফুলিয়া লাল ও ব্যথা হইলে (ঠুন্‌ক)

---

* বেনের দোকানে পাওয়া যায়।

১ তোলা নিশাদল (*) আধ পোয়া জলে ভিজাইয়া নেকড়ার পটী করিয়া ঐস্থানে লাগাইবে ও পুনঃ পুনঃ ঐ জলে ভিজাইয়া দিবে, ইহাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঠুন্‌ক রোগ আরাম হয়।

২৬। প্রাতে ও বৈকালে আধ ছটাক পরিমাণ কর্পূর মিশ্রিত জল থাইলে এবং সর্ব্বদা কর্পূরের ঘ্রাণ লইলে সর্দ্দি ভাল হয়। শিশুদিগকে ঐ জল অতি অল্প পরিমাণে সেবন করাইতে হয়।

২৭। তিন ভাগ গেরিমাটী, অর্দ্ধভাগ গোলমরিচ, সিকিভাগ কর্পূর, এই তিনটী দ্রব্য একত্রে মিশ্রিত করিলে উত্তম দন্তমার্জ্জনী তৈয়ারি হয় এবং দাঁত ফুলা ও কনকনানি উপশমিত হয়।

২৮। আম থাইয়া বদহজম হইলে আদা থাইলে সারে।

২৯। দুগ্ধ পান জনিত অজীর্ণ হইলে ঘোল বা লেবু থাইলে ভাল হয়।

৩০। ঘৃতপক্ক দ্রব্য থাইয়া অজীর্ণ হইলে কতকগুলা লবঙ্গ চিবাইয়া কিম্বা পিপুল চূর্ণ থাইলে ভাল হয়।

ঐ ঔষধগুলি সাধারণ পীড়ার পক্ষে অনেক উপকারে আসিবে। ঐগুলি জানিয়া রাথা স্ত্রীজাতির অবশ্য উচিত এবং পিতামহী মাতামহী প্রভৃতি প্রাচীনাগণের নিকট

* বেনের দোকানে পাওয়া যায়।

টোট্‌কা ঔষধ শিক্ষা করিলে সংসারে প্রভূত উপকার হয়। অনেক সময় সাধারণ ডাক্তারের চিকিৎসায় যে উপকার না হয়—মুষ্টিযোগের দ্বারা তাহার শুভফল হয় ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

সাধুতা।

কি স্ত্রী কি পুরুষ সাধুতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সকল কার্য্য সাধন করা সকলের পক্ষে সমান কর্ত্তব্য। সংসারে যদি প্রত্যেকে সাধুতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে পরিচালিত হন, তবে শঠতা, ধূর্ত্ততা, প্রতারণা প্রভৃতিতে সংসার জ্বালাময় হইতে পারে না।

সাধুতার ফলে মানব ইহলোকে ও পরলোকে পরম শান্তি লাভ করেন। পরলোক অর্থে কেবল মৃত্যুর পর নহে; বর্ত্তমান মানবের পর তাহার বংশপরম্পরার সমবর্ত্তীর কালকে পরলোক বা পরকাল বলা যাইতে পারে। নিজের কর্ম্মফল আপনাকে অতিক্রম করিয়া বংশপরম্পরার উপর সমধিক প্রভুত্ব করে—ইহা আমরা প্রতি নিয়তই দেখিতে পাই। পিতা, পিতামহ,মাতামহ প্রভৃতির মান সম্ভ্রম ধন

ঐশ্বর্য্য আধি ব্যাধি প্রভৃতি যেমন বংশধরগণের উপর আধিপত্য করে, তাহাদের প্রত্যেক কর্ম্মফলও তদ্রূপ সন্তান সন্ততির উপর সম্বেষ্টিত হইয়া পড়ে। পূর্ব্ব পুরুষগণের মান সম্ভ্রম অর্থাদিতে যখন বর্ত্তমান বংশধরগণ অধিকারী হইতে পারেন,তখন তাঁহাদিগের অর্জ্জিত অসৎ কর্ম্মের ফল বর্ত্তমান বংশধরদিগকে ভোগ করিতে হইবে না তাহা কথনই হইতে পারে না। অনেক স্থলেই দেখা যায় পূর্ব্ব পুরুষগণের দুষ্কৃতি ফলে বর্ত্তমান বংশধরগণ সমাজের নিকট হেয় হইয়া পড়িয়া আছেন।

মানবের কর্ম্মফল যখন সমগ্র বংশপরম্পরায় সম্বেষ্টিত হয় তখন সাধুতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা মানবের অবশ্য উচিত।

মাতার কর্ম্ম দূষিত হইলে সন্তানকে জর্জ্জরিত হইতে হয় এ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন ;—

"মা হওয়া কি মুখের কথা,
কেবল প্রসব ক'রে হয় না মাতা।"

বস্তুতঃ মাতৃত্ব মুখের কথা নহে, মাতার দায়িত্ব বড়ই অধিক। মাতার প্রকৃতি সৎ না হইলে সমাজে সৎপ্রকৃতি সম্পন্ন মানবের বহুল আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। অতএব সাধুতাচরণ নারী জাতির অবশ্য কর্ত্তব্য। সাধুতা রত্নে ভূষিত হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে সৎচরিত্রের প্রয়োজন। শাস্ত্র বলিয়াছেন ;—

শীলং প্রধানং পুরুষে তদ যস্যেহ প্রণশ্যতিঃ।
নতস্য জীবিতে নার্থো ন ধনেন ন বন্ধুভি ॥

উদ্যোগপর্ব্ব।

অর্থাৎ মানবের পক্ষে চরিত্রই প্রধান গুণ, চরিত্রহীন ব্যক্তির ধন বন্ধু প্রভৃতি সমস্তই বিফল।

চরিত্র হীন ব্যক্তির মনুষ্যত্ব থাকে না, তাঁহার সংসর্গে সমাজ আতঙ্কিত। সন্তানের চরিত্র গঠিত করিবার পক্ষে মাতাই প্রধান সহায়। সেই মাতা যদি অসৎ প্রকৃতি সম্পন্না হয়েন, তবে সৎসন্তানের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। অতএব নারীজাতি যাহাতে সাধুতা হইতে এক পদও বিচ্যুত না হন তদ্বিষয়ে তীব্র দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

পবিত্র চরিত্রের উপর সাধুতার ভিত্তি গঠিত হয়। যিনি আত্মাভিমান রহিত, পরের মঙ্গলার্থে যাঁহার প্রাণ মন উৎসর্গীকৃত, তিনিই সাধুনামে অভিহিত হন। সাধুতা অবলম্বন করিতে হইলে সংসারের সহিত বিযুক্ত সম্বন্ধ হইতে হইবে এরূপ নহে—সংসারের অশেষ ভোগ বিলাসের মধ্যে থাকিয়াও যাঁহার কার্য্য ও ব্যবহারাদি সৎ হয়, তিনিই সাধু। অরণ্যবাসী সাধু অপেক্ষা গৃহী সাধুর মাহাত্ম্য অধিক; কারণ সংসারের সহিত যাঁহারা সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়াছেন, কোন প্রলোভনীয় বস্তু তাঁহাদিগের নয়নপথে সহজে পতিত হয় না—কিন্তু গৃহী ব্যক্তিদিগকে প্রতিনিয়ত ঐ সকল বিষয়ের সংঘর্ষণে পেষমান হইতে হয়, তথাচ যিনি

তাহাতে আকৃষ্ট না হইয়া জীবন-সংগ্রামে জয়লাভ করিতে পারেন, তিনি অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হন—তিনিই প্রকৃত সাধু।

লোভ, মোহ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি বৃত্তিকে আয়ত্তাধীন করিয়া সমদর্শিতা অবলম্বন পূর্ব্বক সংসারে যথোচিত কর্ত্তব্য পালন করাই সাধুতার কার্য্য। মানুষ একদিনে সাধুতার চরম সীমায় উন্নীত হইতে পারে না। আজীবন ইহার অনুশীলন করিতে হয়, তবেই ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে মানব জীবনে মধুর ফল ফলিতে থাকে। মানুষ দুর্ব্বল, প্রতি-নিয়তই তাহাদের পদস্খলন হওয়া সম্ভব, এই জন্যই এক গাছি সুদৃঢ় রজ্জু ধরিয়া সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হয়। সেই রজ্জু হইতেছে ধর্ম্ম। ধর্ম্মপ্রাণতা ব্যতীত সাধুতা রক্ষা হইতে পারে না। কর্ম্মের দ্বারাই ধর্ম্মের উৎপত্তি। কর্ম্ম অধোগতির কারণ, আবার কর্ম্মই ঊর্দ্ধগতির সোপান।

যাত্য ধোধো ব্রজত্যুচ্চৈনরঃ স্বৈরীব কর্ম্মভিঃ।
কূপস্য খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্যেব কারকঃ॥

হিতোপদেশ—৩০৫।

অর্থাৎ কূপ খননকারী যেমন ক্রমে নিম্নে যায় এবং প্রাচীরগাথক উচ্চ দেশারোহণ করে, মানুষ সেইরূপ স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা উচ্চতা বা নীচতা প্রাপ্ত হয়। এই জন্য সর্ব্বদা সৎকর্ম্মানুশীলন প্রয়োজন।

মাতৃ জাতি সৎকর্ম্মনিষ্ঠ হইলে প্রত্যেক পুরুষের মধ্যে

সেই গুণরাশি প্রসারিত হয়। এক সময় জেনারেল্ বুথ্ তাঁহার স্বর্গীয় পত্নীর নামোল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি যাহা তাহা হইতে পারিতাম না, যদ্যপি মিসেস বুথ্ আমার পত্নী না হইতেন।"

কোনরূপ দুঃখ যন্ত্রণায় পতিত হইলে, তাহা হইতে মুক্তিলাভের জন্য সৎভাবে চেষ্টা করা উচিত। "ভগবান্ যাহা করিবেন তাহা হইবে" এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া কার্য্য-ক্ষেত্রে না খাটিয়া জড়বৎ বসিয়া থাকা অলসতার কার্য্য।

এরূপ অলসতা হইতে সামাজিকগণের মধ্যে কর্ম্ম-নিষ্ঠতা হ্রাস হইয়া সমাজকে উদ্যম ও উৎসাহ শূন্য করিয়া তুলে। সমাজকে এইরূপে অলসতা স্ত্রীজাতিই শিক্ষা দিয়া থাকেন। ঈশ্বরনিষ্ঠা মন্দ জিনিষ নহে, পরন্তু ঈশ্বর নিষ্ঠা ব্যতীত সাধুতা রক্ষা হয় না, কিন্তু ঈশ্বর নিষ্ঠার সহিত কার্য্যক্ষেত্রে খাটিয়া যাওয়া চাই। জগত কর্ম্মক্ষেত্র, এখানে কর্ম্মত্যাগ করিলে অন্যায় করা হয়। গীতায় স্বয়ং ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন "যদি তোমার কর্ম্মের আবশ্যক না থাকে, অন্যের মঙ্গল সাধনের জন্য কর্ম্ম করা তোমার কর্ত্তব্য।" তবেই দেখ কোন অবস্থাতেই কর্ম্ম পরিত্যাজ্য হইতে পারে না। পুরুষকার ব্যতীত দৈব বল কোন কার্য্যকরী নহে। দৈব বলের সহিত পুরুষকার সংযোগ হইলেই অমৃতময় ফল লাভ হয়। পুরুষকারের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে খাটিয়া যাও। পুরুষকার ব্যর্থ বা অব্যর্থ যাহাই

হউক না কেন, তোমার তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই, তুমি তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য বোধে খাটিতে থাক।

মানুষ বাসনা করে, ভগবান্ তদিচ্ছানুযায়ী ফল প্রদান করেন। কিন্তু তাই বলিয়া তুমি কর্ম্মক্ষেত্রে খাটিতে পরাঙ্মুখ হইয়া অলসতার প্রশ্রয় দিলে তোমার জীবন অশেষ যন্ত্রণাময় হইবে। এই জন্যই সাধুগণ কার্য্যক্ষেত্রে খাটিয়া যাইবার উপদেশ প্রদান করেন, অলস ও অকর্ম্মণ্য হইতে উপদেশ দেন না।

যিনি এই নীতি পালন করিতে পারেন, তিনিই সাধু। কার্য্যক্ষেত্রে খাটিয়া বিফল মনোরথ হইলে ব্যথিত হওয়া উচিত নহে—কর্ত্তব্য ক্ষেত্রে খাটিতে খাটিতে বিফল হইলেও এক দিন না একদিন অভীপ্সিত দ্রব্য লাভ হইয়া তোমার চিত্ত সুখের অমৃতময় স্রোতে ভাসমান হইবেই হইবে। দিনবন্ধু বাবু গাহিয়াছেন,—

"যে মাটিতে পড়ে লোক উঠে তাই ধ'রে,
বারেক বিফল হ'লে কে কোথায় মরে।
যতই তুফান হ'ক না ছাড়িব হাল,
আজ না হইলে ফল হ'তে পারে কাল।

নবীন তপস্বিনী।

বস্তুতঃ কথাটা মিথ্যা নহে, যে বিষ প্রাণ সংহার করে, প্রয়োগ গুণে সেই বিষই অমৃত হইয়া এক সময় মানবকে আশু মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করে। এই সকল বুঝিয়া

সহস্র দুঃখ ক্লেশ ভোগ সত্বেও কর্ত্তব্যানুশীলনই মানবের উচিত। সংবৃত্তি সকল অনুশীলন করিতে করিতে মানব হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হয়—সঙ্কীর্ণতা বিদূরিত হইলেই মহান্ ভাব সমূহের দ্বারা চিত্ত পরিপূর্ণ হয়। যখন হৃদয়ের এই অবস্থা ঘটে, তখন শত্রু মিত্র আত্ম পর প্রভৃতি ভেদাভেদ জ্ঞান বিলুপ্ত হয়, তখন তিনি বিশ্বের ও বিশ্ব তাঁহার হইয়া পড়ে। এই অবস্থা লাভ হইতেছে সাধুতার চরম ফল। শাস্ত্র মতে -

বৈরাগ্যপূর্ণতামেতি নাশাবশানুগম।

যোগবাশিষ্ঠ।

অর্থাৎ বৈরাগ্য বৃত্তির অনুশীলনে হৃদয় পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, বিষয়াবদ্ধ চিত্ত কদাচ পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না। তাহাদিগের কেবল নানারূপ যন্ত্রণা ভোগ হয় মাত্র। সংসারে থাকিয়া সাধুতা লাভ হয় না ইহার অর্থ তাহা নহে। প্রকৃত পক্ষে গার্হস্থ্য আশ্রমই সাধুতার ক্ষেত্র। শাস্ত্রোক্ত ঐকয়েকটী কথার তাৎপর্য্য—বিলাস চরিতার্থের জন্যে যে চিত্ত একান্ত সংবদ্ধ, বিষয় ভোগ ব্যতীত যে চিত্ত অন্য চিন্তা ধারণা করিতে অসমর্থ, তাঁহারই জীবন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না। যাঁহারা সংসারে অবস্থান করিয়া কর্ত্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জীবন নিয়ন্ত্রিত করেন, এ কথা তাঁহাদের জন্য নহে। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তি গৃহে থাকিয়াও সন্ন্যাসী। রাজা অম্বরিষ শ্রীরামচন্দ্র প্রভৃতি অনন্ত রাজকার্য্যের মধ্যে থাকিয়াও

দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। শাস্ত্রকারগণ মানবের জন্য অরণ্য বাসই বৈরাগ্যের যোগ্য স্থলনির্ণয় করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের সেই বাক্য সকলের মর্ম্মানুসন্ধান করিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, তাঁহারা মানবকে চুটাইয়া সংসার করিয়া লইয়া তবে অরণ্য বাসের ব্যবস্থা দিয়াছেন। শাস্ত্র যে সময় অরণ্য বাস কাল নিরূপিত করিয়াছেন, তৎকালে মানবের জীবন উৎসাহ উদ্যম শূন্য হইয়া আসে, পরলোক চিন্তা আসিয়া আপনা হইতেই হৃদয়কে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। সে সময় এক মাত্র অধ্যাত্ম চিন্তা ব্যতীত পার্থিব কোন রূপ কার্য্য তাঁহার দ্বারা সুসাধিত হওয়া কঠিন।

মানবের ঐ ভগ্ন নিরুৎসাহময় জীবনই আর্য্যমতে অরণ্য বাসের কাল। এই সময় যাঁহারা সংসার সম্বন্ধে শিথিলাসক্তি হন, তখন পুত্র পৌত্রাদিতে তাঁহাদের গৃহ পরিপূর্ণ হয়। সাংসারিক উন্নতি, সামাজিক উন্নতি, পারিবারিক উন্নতি প্রভৃতি কার্য্যের ভার সেই পুত্র পৌত্রাদির উদ্যমশীলতাময় নবীন জীবনের প্রতি উৎসর্গ করিয়া যান। সুতরাং এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের বৈরাগ্য গ্রহণে সমাজে বা পরিবারে কোন রূপ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা নাই; কিন্তু যাঁহারা অকালে বৈরাগ্যের দোহাই দিয়া পরিবার অথবা সমাজের প্রতি উদাসীন হন, তাঁহারা সাধারণের প্রভূত অনিষ্টসাধন করিয়া থাকেন।

সংসারে গৃহিণী, বধূ ও কন্যা* প্রভৃতির আদর্শ।

গৃহিণীর চরিত্র যেরূপ ভাবে প্রধাবিত হইবে, তাঁহাদের সংসারের ভাবী গৃহিণীর চরিত্রও তদনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হইবে। অতএব বৈরাগ্যের দোহাই দিয়া সংসারে ঔদাসীন্য প্রকাশ গৃহিণীর উচিত নহে। তাহা হইলে আর সকলের চরিত্রেও সেই উদাসীনতা পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। গৃহিণীর চরিত্র প্রকৃত পক্ষে ঈশ্বরাভিমুখে ধাবিত হইলেও সে উচ্ছ্বসিত চিত্তকে দমিত করিয়া সংসারের ভাবী গৃহিণী দিগকে গঠিত করিবার জন্য সংসারে কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদিত করা গৃহিণীর উচিত।

আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে সংসারীগণের পক্ষে যে নিয়ম সকলের ব্যবস্থা আছে, তাহা প্রতিপালন করিতে পারিলেই সাধুতা রক্ষা হইয়া থাকে। মানুষ স্বীয় কর্ত্তব্য বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইয়া যদিও সাধুতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তথাচ অসৎ সঙ্গে বাস করিলে সহজেই অবনতি ঘটিতে পারে। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ অসৎ সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবার জন্য পুনঃপুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। শিক্ষা-হীনতা হইতেই মানুষ অসৎ হইয়া পড়ে। মানবের মাতা ও স্ত্রী যেরূপ জীবনের সঙ্গী এরূপ আর কেহই নহে; ইহাঁদের সহিত মানবকে অহোরহঃ বাস করিতে হয় সুতরাং ইহাঁদের প্রকৃতি দূষিত হইলে প্রত্যেক মানবের অবনতি ঘটিবে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই; সুতরাং স্ত্রীজাতির প্রকৃতিকে উন্নত করিবার জন্য যত্নবান হওয়া সকলেরই প্রয়োজন।

আপনাদের চরিত্রকে দেবী চরিত্রে পরিণত করিবার নিমিত্তও সংসারে নিজ নিজ গৌরব-পতাকা উড্ডীয়মান করিবার জন্য স্ত্রীজাতির জীবন মন উৎসর্গ করা উচিত। ইহাতে কেবল পুরুষ জাতিরই ইষ্ট সাধন হইবে তাহা নহে, সমগ্র বিশ্বের হিতসাধন হইবে।

অধুনা স্ত্রীশিক্ষার নানারূপ বন্দোবস্ত হইতেছে সত্য, কিন্তু সেই শিক্ষা নারী জাতিকে গার্হস্থ্যধর্ম্মের সম্যক উপযোগী করিয়া গঠিত করিতে পারিতেছেনা। ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবিপোপ বলিয়াছেন,—"Little learning is a dangerous thing" অর্থাৎ "অল্পবিদ্যা অনর্থের মূল" কথাটা খুব সত্য। অল্পবিদ্যায় জ্ঞানের উন্মেষ হয় না, অথচ অন্যের প্রতি নির্ভর করিবার প্রবৃত্তি থাকে না, প্রকৃতি চঞ্চল হইয়া উঠে, এরূপ শিক্ষা সমাজের অশান্তির কারণ। অধুনা স্ত্রীজাতির স্বল্প বিদ্যার জন্যই আমাদের সমাজে নানা রূপ অশান্তির উদ্গম হইতেছে, সৎ প্রণোদিত কর্ম্ম সকল বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। স্ত্রীজাতি প্রকৃতরূপ শিক্ষিতা হইলে সমাজে বহু অশান্তি নিবারিত হইবে।

এখন স্ত্রী জাতির মধ্যে অনেকেই দুই পাত লেখা পড়া শিখিয়া অনেকেই শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম সকলের মস্তকে খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত; কিন্তু আমরা দেখিতে পাই হিন্দু শাস্ত্রের প্রত্যেক উপদেশই মূল্যবান, প্রত্যেক ব্যবস্থাই মানবের হিত সাধনে উন্মুখীন। হিন্দুশাস্ত্র মতে যে সকল বার ব্রত

পূজা হোম প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে, ইহাও আমাদের সাধুতা রক্ষারই অনুকূল। এই সকল নিয়ম প্রতিপালনে চিত্ত অসৎ পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া সদাচারের দিকে ধাবিত হয়। হৃদয়ের মলিনতা বিধৌত হয়। হিন্দুর যে দুর্গা পূজা, ইহা রাজসিক কর্ম্ম হইলেও ইহা হইতে ক্রমে সত্বগুণের উদয় হয়; কারণ এই মহাশক্তির পূজা করিতে সমধিক ঐশী শক্তির প্রয়োজন—সেই ঐশী শক্তির অনুশীলনই শক্তি পূজা। যাহা ঐশী শক্তি সম্ভূত তাহা সৎবস্তু। কতকগুলি বাহ্য ক্রিয়ানুষ্ঠানের জন্যই দুর্গা পূজার পূর্ণ সাত্বিকতা নর-লোচনে প্রতিভাত হয় না।

শক্তি-সাধকগণ দেবীর সম্মুখে যাত্রা নাচ গান প্রভৃতির অনুষ্ঠান ও পশু রক্তের ছড়াছড়ি করিয়া আপনারা আনন্দ লাভ করেন, এই সকল কারণেই দুর্গা পূজার সাত্বিকতার প্রত্যবায় ঘটে। ঐ সকল কার্য্যের মাদকতা শক্তিগুণে মানুষ এত বিভোর হইয়া পড়ে যে, মহাশক্তির পূজার্চ্চনায় যে শক্তির প্রয়োজন তাহার অভাব ঘটে। শক্তি পূজায় পশু বলিদানের ব্যবস্থা আছে সত্য, কিন্তু তাহা মেষ মহিষাদির জীবন হত্যার ব্যবস্থা নহে। এই বলি প্রথার জন্য শক্তিসাধক রামপ্রসাদ দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন,—

"জগতকে খাওয়াচ্ছেন যে মা
সুমধুর খাদ্য নানা,

কোন্ লাজে তায় দিতে চাস্‌রে
মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা।"

যাহা রাম প্রসাদের ন্যায় শক্তি-সাধকেরও অনুমোদিত নহে, তাহা কখনই শক্তি পূজার অঙ্গীভূত হইতে পারে না। বিশেষতঃ শাস্ত্রালোচনা দ্বারা বুঝা যায়, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি রিপু বর্গকে শাস্ত্রকারগণ মেষ মহিষ প্রভৃতি পশুর নামে উক্ত করিয়াছেন। দেবীর সম্মুখে শাস্ত্র সেই পশু বলিদানেরই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই সকল পশুর বলিদানেই প্রচুর পরিমাণে ঐশী শক্তি লাভ হয়। মহা-শক্তির অর্চ্চনা করিয়া মানুষ দেবত্ব লাভে সমর্থ হয়।

মহাশক্তির কৃপালাভ করিতে হইলে সংযতচিত্তে তদীয় আরাধনা করিতে হয়, তবেই ঐশীশক্তি লাভ হয়। এই জন্যই বিজয়া দশমীর দিন হিন্দুর বড় আদরের দিন, সেই দিনটী মহামায়ার মহান্ আশীর্ব্বাদ। সকলে আত্ম পর ভুলিয়া পরস্পর পরস্পরকে স্নেহালিঙ্গন করিয়া কৃতার্থ হয়। প্রাণের ভিতর কি জানি কেমন এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। যাঁহার সহিত বহুদিনের মনোমালিন্য, আজ সে মালিন্য দূর হইয়াছে, কনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠের চরণে প্রণত হইয়া তাহার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন, বয়ঃ জ্যেষ্ঠ প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ দান করিতেছেন। এই খানেই দুর্গা পূজার সাত্বিকতার উদয়। সাত্বিকতা উদ্দীপিত করিবার জন্যই হিন্দু সমাজে বার ব্রত দুর্গোৎসব

প্রভৃতির ব্যবস্থা। সাত্বিকতা হইতে ক্রমে মহাভাব লাভ হইয়া থাকে। জাগতিক ভাব পরিহার পূর্ব্বক মানব যখন ভাব রাজ্যে উপনীত হয়, তখন প্রাণ মন চিত্ত এক অপার্থিব আনন্দময় হইয়া উঠে। কার্য্য ও ব্যবহারে জগতে সেই আনন্দের বাহ্য বিকাশ হইয়া তিনি জগতরে শান্তি স্থাপয়িতা রূপে জগতের নমস্য হইয়া থাকেন।

আমরা দেখিতে পাই জগতের প্রত্যক কার্য্যের সহিতই স্ত্রী জাতি অতি ঘনিষ্ঠ রূপে জড়িত, সুতরাং স্ত্রী-জাতির নৈতিক ও ধর্ম্ম জীবনের উন্নতি ব্যতীত সমাজের উন্নতি হইতে পারে না। অতএব সাধুতার প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্যরাখা স্ত্রী জাতির অবশ্য কর্ত্তব্য। ঈশ্বর বিশ্বাস যাঁহার যতই শিথিল, তাঁহার সাধুতা ততই সুদূরবর্ত্তী। তিনি কদাচ বিরাট বিশ্বকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিশ্ব-প্রেমিক হইতে পারেন না। বিশ্ব প্রেম বিকাশই সাধুতার মুখ্য ফল। সর্ব্ব প্রাণীকে স্বীয় জীবনবৎ প্রিয় জ্ঞান করিয়া সকলের হিতসাধন করা সাধুতার কার্য্য। যাঁহার কার্য্য ও ব্যবহার সকলের প্রীতিপ্রদায়ক হয়, তিনিই প্রকৃত সাধু। যিনি সুখে উন্মত্ত ও দুঃখে অধীর না হন, যাঁহার হৃদয় "বজ্রাদপি কঠোরাণি কোমলা কুসুমাদপি" তিনিই জগতে সাধুনামে অভিহিত হন। যিনি ঘৃণ্য বস্তুকেও ঘৃণা না করিয়া পরম পবিত্র বস্তুর ন্যায় কোলে টানিয়া লইতে পারেন, তিনিই যথার্থ সাধু।

ভোলানাথ মহেশ্বরকে আমরা সাধুতার মধুর মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। যে ধুতুরা, আকন্দ, অস্থিমালা, বৃষ দেবতাগণও গ্রহণ করেন নাই, সেই ঘৃণ্য বস্তুগুলিকে তিনি সমাদরে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহার অপরিসীম সাধুতার ফলেই কাল বিষধরও বন্ধুবৎ তাঁহার হৃদয়ে দোদুল্যমান হইয়া ক্রীড়া করিতেছে। বস্তুতঃ সাধুতার মোহিনী শক্তিতে সমস্ত জগতই পদানত হয়। দেবাদিদেব মহাদেব যে এমন পবিত্র হইতে পারিয়াছেন, তাহার মূল তদীয় প্রিয়তমা পার্ব্বতী। সূর্য্যের রশ্মিতে চন্দ্র যেমন উজ্জ্বলীকৃত, পার্ব্বতীর সতীত্বে শিব তদ্রূপ পবিত্র। তাই শক্তি বিনা শিব অসম্পূর্ণ।

পত্নী পবিত্র না হইলে পতির সাধুতা রক্ষা হয় না; সেই জন্যই সতী দক্ষালয়ে প্রাণ ত্যাগ করিলে, তাঁহাকেই পত্নীরূপে পাইবার জন্য মহেশ্বর হিমালয় প্রদেশে কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন।

হিন্দু শাস্ত্র, ইতিহাস এবং ইংরাজিগ্রন্থাদি পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, সমাজে সাধুতা বিকাশ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে তাহা নারী জাতিতে প্রসারিত করিতে হইবে।

সংযম।

গৃহস্থাশ্রম বাসিগণের পক্ষে সংযম একটী প্রয়োজনীয় বস্তু। গৃহীব্যক্তি সংযম সোপান অতিক্রম করিয়া অমিতাচারী হইলে তদীয় সংসর্গে বহু লোকের অনিষ্ট সংঘটন হইয়া থাকে। যাঁহার বিচার শক্তি যতই ক্ষীণ তাঁহার সংযম বৃত্তি ততই শিথিল। সাধারণতঃ স্ত্রী জাতি পরিণামদর্শীশক্তিহীন, এই জন্যই তাঁহাদের সংযম শক্তি বড়ই কম। স্ত্রীজাতীর সংযম শূন্যতা সমাজোন্নতির একটী বিষম অন্তরায়। স্ত্রীজাতীর সংযমশূন্যতা হইতেই ভ্রাতৃবিরোধ, তাহা হইতে একতা নষ্ট হয়, ক্রমে সেই অনল সমাজে সম্প্রসারিত হইয়া বিষম আশান্তি উদ্গীরণ করিতে থাকে। যাঁহার সংযম নাই, তাঁহার মনুষ্যত্ব নাই। সংযম হীন ব্যক্তি করিতে না পারে এমন অসৎ কার্য্য কিছুই নাই। পুরাণকার বলিয়াছেন ;—

ততঃ সঙ্কল্প বীজেন কামেন বিষয়েষুভিঃ।
বিদ্ধঃ পততি লোভাগ্নৌ জ্যোতির্লোভাৎ পতঙ্গবৎ।

বনপর্ব্ব।

অর্থাৎ উজ্জল আলোক দর্শনে পতঙ্গ যেমন বিমুগ্ধ চিত্তে তাহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া ভস্মীভূত হয়, অজ্ঞান ব্যক্তি তদ্রূপ বিষয়লালসা রূপ তীক্ষ্ণশরে সংবিদ্ধ হইয়া

লোভ রূপ দাবানলে দগ্ধীভূত হয়। সংযমস্পৃহা বলবতী থাকিলে এরূপ হইতে পারে না।

দুষ্টাশ্বে আরোহণ করিলে সে মানুষকে বিপথে লইবেই লইবে, তদ্রূপ ইন্দ্রিয় সকলকে দমন না করিলে মানুষের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহারা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইবেই হইবে। সুতরাং মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, ইন্দ্রিয়সংযম করা নিতান্ত আবশ্যক।

জিতো যেনেন্দ্রিয় গ্রামং সশূর কথ্যতে বুধৈঃ।

দক্ষসংহিতা।

তাৎপর্য্য এই যে, যে দৈহিক বলের দ্বারা দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে, তাহাকে বীর বলে না, যিনি ইন্দ্রিয় সকলকে আয়ত্তাধীনে আনিতে পারেন তিনিই প্রকৃত বীর।

মানসিক বলই ইন্দ্রিয় বিজয়ের পক্ষে প্রধান সহায়। সংযম বৃত্তির অনুশীলন ফলেই প্রভূত মানসিক বলের সঞ্চার হয়। মানবের যাহা প্রয়োজন হিন্দু ঋষিগণ তাঁহাদের অপরিসীম ঐশীক শক্তির অনুশীলনে তাহা সম্যকরূপ অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই চিন্ময় জ্ঞানের মধুর ফল হিন্দুর অগণ্য বার ব্রত ধ্যান ধারণা প্রভৃতি। হিন্দুর সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরময়, তাহাদের প্রতি মুহূর্ত্তের কার্য্য সকলই ঈশ্বরোদ্দেশে অনুপ্রাণিত।

প্রতিমা পূজা হোম প্রভৃতির আচরণ না করিলে

সাধুতা বা সংযম রক্ষা হয় না, আমরা অবশ্য তাহা বলিতেছিনা, তবে হৃদয় নির্ম্মল করিবার পক্ষে এই সকল নীতিকে প্রথম সোপান বলা যাইতে পারে—হৃদয় পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে তখন চিত্ত ব্রহ্মময় হইয়া পড়ে। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়াছেন "মানুষ যতক্ষণ নিম্নে থাকে, ততক্ষণই জমিতে আলি দেখিতে পায়, উর্দ্ধে উঠিলে আর তখন কোনও পার্থক্য থাকে না, তখন সমস্তই সমান হইয়া যায়" একথা সম্পূর্ণ সত্য। ঈশ্বরের দিকে অনুপ্রাণিত করিবার জন্যই ঋষিগণ নানা দেবতার পূজাদি কীর্ত্তন করিয়াছেন। যিনি যে ভাবে পারিয়াছেন তিনি সেই ভাবে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্যই "নানা মুনির নানামত" দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকলকারই মুখ্য উদ্দেশ্য এক দিকে নীয়মান। ঈশ্বরচিন্তা ব্যতীত মানুষ প্রভূত শক্তি লাভ করিয়া আত্মবিজয় করিতে সমর্থ হয় না। পণ্ডিত ৺রাজনারায়ণ বসু তাঁহার "একাল আর সেকাল" গ্রন্থে বলিয়াছেন "উপাসনা যেমন মনের টনিক এমন আর কিছুই নহে"। কথাটী খুব সত্য। মানব হৃদয় বায়ুবৎ বেগশালী, সেই আবেগময় হৃদয়কে সংযত করিয়া সংসার ক্ষেত্রে পরিচালিত করিতে একমাত্র ঈশ্বর চিন্তাই সমর্থ। ঈশ্বরনিষ্ঠা ব্যতীত যে সংযম অভ্যাস, তাহা সুদৃঢ় হইতে পারে না, তাহা বালির বাঁধ বিশেষ। একটু স্রোতেই ভাসিয়া যাইতে পারে; এমতে ঈশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংযম

অনুশীলন করা প্রয়োজন। দেবতা অর্চ্চনাদি হইতে এই নিষ্ঠা প্রগাঢ়ীভূত হয়। ধর্ম্মের জন্য হিন্দুসন্তান চিরদিন পাগল, ধর্ম্মের জন্য হিন্দু নর নারী না করিতে পারেন এমন কোন কঠোর কার্য্যই নাই। যে সন্তান জননীর প্রাণাধিক প্রিয়, মৃত্যুকালেও যে স্নেহময় সন্তানকে বক্ষপুটে চাপিয়া রাখিতে চাহেন, যে সন্তানকে এক দণ্ডের জন্য অন্যের নিকট রাখিয়া প্রীতি নাই, সেই হিন্দু জননী অতি শিশু সন্তানকে ফেলিয়াও অনায়াসে দুর্গম পথাদির ক্লেশ সহ্য করিয়া ধর্ম্মার্থে প্রফুল্ল বদনে তীর্থাভিমুখে প্রধাবিত হন। আমাদের নয়ন পথে যখনই এই দৃশ্য পতিত হয়, তখনই আমরা বুঝিতে পারি হিন্দু নর নারী ধর্ম্মার্থে কিরূপ পাগল, ধর্ম্মার্থে তাহারা কত খানি আত্ম বলিদান করিতে পারেন। কিন্তু এই কার্য্যে যে প্রভূত মানসিক বলের প্রয়োজন, তাহা কি বলিতে হইবে! এই মানসিক বলের জন্ম কোথায় একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় প্রতিমা পূজাই এই মানসিক বলের জনক। ঐ পদ্মপলাশ লোচন দারু নির্ম্মিত জগন্নাথ দেব যদি এই নীলাচল ক্ষেত্রে অবস্থান না করিতেন, তবে আজ লক্ষ লক্ষ নর নারী পতি পুত্রাদি ফেলিয়া সেই সুদূর প্রবাসে ছুটিয়া যাইতে পারিতেন কি? তবে কথা হইতে পারে প্রতিমা দর্শন করিতে না দৌড়াইলে কি আর মানসিক শক্তির বিকাশ হয় না? অবশ্যই হয়; কিন্তু তাহা বহু আয়াস সাপেক্ষ, আর

প্রতিমা তত্ত্বের দ্বারা শক্তি লাভ অপেক্ষাকৃত সহজ, এই জন্যই দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তির পক্ষে প্রতিমা পূজা উপেক্ষণীয় বিষয় নহে ।

হিন্দু-নারী বাল্য হইতেই "এটা করিতে নাই ওটা বলিতে নাই" প্রভৃতি শিক্ষা অভিভাবকগণের নিকট প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই সময় হইতেই ধীরে ধীরে তাহাদিগের মানসিক বলের সৃষ্টি ও সংযম শিক্ষা আরম্ভ হয়, বয়োবৃদ্ধির সহিত যতই ইহা অনুশীলিত হয়, ততই অমৃতত্ব লাভ করে। শাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

ইন্দ্রিয়ানাং নিরোধেন রাগ দ্বেষ ক্ষয়ে ন চ ।

অহিংসায়াচ ভূতানাম্ মৃতত্বায় কল্পতে ।

মনু—৬ ৬০ ।

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন রাগ হিংসা দ্বেষ জীবহিংসা শূন্যাদি দ্বারা মানুষ দেবত্ব লাভ করিয়া থাকে ।

সংযম-বৃত্তির অনুশীলনেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির আজও হিন্দুর নিকট প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন ।

হিন্দু ঋষিগণ, মানুষকে দেব পূজাদি দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লইয়া তাঁহাদের চিত্ত এইরূপ ভাবে গঠিত করিয়া দেন যে, তাঁহাদের দ্বারা কি আধ্যাত্মিক কি সাংসারিক কি নৈতিক সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে ; তখন তাঁহারা অনায়াসেই ভগবানের বিরাট ব্যাপিত্ব এবং তাঁহার অব্যক্ত মূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণা করিতে সমর্থ হন ।

কেহ কেহ বলেন হিন্দু শাস্ত্র মানুষকে ধর্ম্মরাজ্যের দিকে যতটা আকর্ষণ করিয়াছেন সংসার কার্য্যে ততটা আহ্বান করেন নাই। তাঁহাদের বিবেচনায় ঋষিগণ মানবের সাংসারিক উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন ; কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। কারণ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, তাঁহারা ধর্ম্মরাজ্যের যে অমৃতবর্ষিণী বীণা বাদন করিয়া মানবকে আকর্ষণ করিতেছেন, তাহাই মানবের উন্নতির মূল সোপান। সাংসারিক উন্নতি সামাজিক উন্নতি প্রভৃতির মূল ভিত্তিই ধর্ম্ম। সাংসারিক ব্যক্তির যদি ধর্ম্মপ্রাণতা না থাকে, তবে তাহার কর্ত্তব্য জ্ঞান ও থাকিবে না। যাহার কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই, কি সাংসারিক কি সামাজিক কি নিজের তাঁহার প্রবর্ত্তিত কোন কার্য্যই মঙ্গলদায়ক হয় না। সংসারে ধর্ম্মপ্রাণতারই সবিশেষ আবশ্যক। ধর্ম্মপ্রাণতা উজ্জ্বলীকৃত হইলেই মানব হৃদয়ে সাংসারিক সামাজিক প্রভৃতি কর্ত্তব্য জ্ঞান সমধিক বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এই জন্যই ঋষিগণ কর্ত্তব্যের তান ধরিয়া ধর্ম্মের বীণা বাদন করিয়াছেন। হিন্দু রমণী সেই বীণা ধ্বনিতে প্রকৃতরূপে অনুপ্রাণিত হইলে তাঁহাদের জীবনে– তাঁহাদের সংসারে—অমৃত স্রোত প্রবাহিত হইয়া যাইবে।

সংযম বৃত্তি ধর্ম্মরাজ্যের সাহায্যকারী হইলেও সংসারক্ষেত্রে তাহা একান্ত অনুশীলনীয়। যাঁহা ধর্ম্মরাজ্যের সহায়

সংসার রাজ্যেও তাহার প্রয়োজন। সংসার, সমাজ ও ধর্ম্ম তিনটি পৃথক বস্তু হইলেও এক মূল বস্তুরই অভিব্যক্তি মাত্র, সকলেরই মূল সূত্র ধর্ম্ম। সেই মূল সূত্র যতই উন্নত হইবে, মানুষও ততই উন্নতি লাভ করিবে। ধর্ম্ম মানবের সকল অবস্থাতেই একমাত্র মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ—কেবল অন্তর্জগতে নহে। সংযম বৃত্তির অনুশীলনে অভাব ঘটিলে ধর্ম্ম বন্ধনের শৈথিল্য ঘটে। সংযম হইতেছে ধর্ম্ম বন্ধনের সুদৃঢ় গ্রন্থি। আর ধর্ম্ম হইতেছে সংসারের সুদৃঢ় ভিত্তি। এইজন্যই যিনি প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে চাহেন, সংযমানুশীলন তাঁহার পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। সংসারে সংযম বৃত্তির নিতান্ত আবশ্যক বলিয়াই হিন্দু শাস্ত্র পুনঃপুনঃ তদ্বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। সংযমবৃত্তি অনুশীলিত না হইলে মানুষ গার্হস্থ্য ধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে না। শাস্ত্র বলেন ,—

সুখঞ্চেহেচ্ছতা নিত্যং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ।

মনু——৩—৭৯।

অর্থাৎ যাঁহারা ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করিতে পারেন না, তাঁহারা গার্হস্থ্য ধর্ম্মাচরণ করিতে অসমর্থ।

স্ত্রীজাতি যখন গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ,তখন সংযম বৃত্তির প্রতি লক্ষ্য রাখা তাহাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য।

সুখের উপায়।

জগত সুখের কাঙ্গাল, বাল্যকাল হইতেই মানব হৃদয়ে সুখস্পৃহা সমূহ বলবতী হইয়া উঠে। বয়ঃবৃদ্ধি ও জ্ঞানোন্মেষের সহিত বর্ষার স্রোতস্বিনীবৎ মানব হৃদয়ে এই প্রবৃত্তি বিপুল দর্পে উদ্দণ্ড নৃত্য করিয়া বেড়ায়। তাহার সেই বীর দর্প কেহ হৃদয় পাতিয়া সহিয়া যান ও ধীর চিত্তে জ্ঞানের আশ্রয় লইয়া তাহার সেবা করিয়া থাকেন, কেহ বা তাহার সেই তীব্র আকর্ষণে এতই অধীর হইয়া পড়েন যে, তাঁহার আর হিতাহিত বিচার শক্তির ক্ষমতা থাকে না, উন্মত্ত প্রাণে তাহারই পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া সমস্ত প্রাণ সমগ্র হৃদয় তাহারই পূজার জন্য উৎসর্গ করেন। ঐ যে সাধক সংসারের সমস্ত সাধ আশা পদদলিত করিয়া নিমীলিত-নেত্রে ঈশ্বরারাধনায় উপবিষ্ট, আর ঐ যে যুবা জগতের জন্য প্রাণপাত করিয়া খাটিতেছেন, আবার ঐযে হতভাগ্য রাজ-দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ফাঁসি কাষ্ঠে লম্ববান হইয়াছে, এ সমস্তেরই একমাত্র মূল কারণ সুখস্পৃহা। জ্ঞান বৃত্তির আশ্রয় লইয়া যিনি সুখের পূজা করেন, তাঁহারই সেই সুখের বৃক্ষ মধুময় ফল প্রদান করে। জগতে সমস্ত কার্য্যই সুখের জন্য অনুশীলিত হয়, ধনীর দান, দরিদ্রের ভিক্ষা, সমস্তই সুখ লাভের আশায়। সন্তানকে ভাল বাসিয়া জননী সুখ

লাভ করেন, তাই জননী স্নেহময়ী মাতাকে "স্বর্গাদপি গরিয়সী" নামে অভিহিত করিয়া সন্তান সুখলাভ করেন, তাই সন্তান মাতার প্রতি ভক্তিমান। পতিকে পূজা করিয়া পত্নী স্বীয় জীবনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করেন,—তাই পত্নী প্রেমময়ী রূপে সংসারে বিরাজিতা অর্থাৎ জগতের সমস্ত কার্য্যই সুখার্থে অনুষ্ঠিত হয়। সূর্য্যের দিকে চাহিয়া সূর্য্যমুখী সুখিনী তাই, সে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া জীবন মরণ লাভ করে, মেঘের সন্দর্শনে শিখি প্রভৃত সুখলাভ করে, তাই তাহার সেই মোহন পুচ্ছ বিস্তৃত করিয়া তালে তালে মধুর নৃত্য পূর্ব্বক তাহার সুখের অনন্ত উচ্ছ্বাস মানব সমাজে বিজ্ঞাপিত করে। কি মানব কি কাণ্ডজ্ঞান হীন পশু সকলেই সুখের মোহন মাধুরীতে উন্মত্ত, তাই বলিতে হয় সমগ্র জগত সুখের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। যাহাকে লাভ করিবার জন্য সমস্ত জগত আকুল তাহার নিবাস কোথায়? ঋষিগণ সংযম ও সহিষ্ণুতাকেই তাহার পবিত্র আবাস বলিয়া স্থির করিয়াছেন। চিন্তা করিয়া দেখিলে তাহাই যে সুখের পবিত্র হর্ম্ম্য, তাহা আর বুঝিতে বাকী থাকে না।

সুখপ্রয়াসী ব্যক্তি যদি অগ্র পশ্চাৎ বিচার না করিয়া আশু সুখলাভের জন্য হঠাৎ কোন একটা গর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ফেলেন তাহার সে কার্য্য আপাত মধুর হইলেও পরিণাম জ্বালাময়ী হইবে—সুখ অনন্ত শান্তিময়

যাহার ফল কোন অবস্থাতেই পরিবর্ত্তিত হয় না, যাহা সর্ব্ব, কালই শান্তি প্লাবিত, তাহাই প্রকৃত সুখ, প্রকৃত সুখ লাভ করিতে হইলে স্থিরপ্রাজ্ঞ হইতে হয়। যিনি প্রাজ্ঞবান নহেন তাহার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি বড়ই ক্ষীণ। যাঁহার ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ক্ষীণ, সুখের পবিত্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ লাভ তাহার পক্ষে দুরূহ।

যিনি সুখের প্রয়াসী শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক সামাজিক, আধ্যাত্মিক প্রভৃতি সকল বিষয় লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাকে কার্য্য করিতে হয়। কোন একটি বিষয়ে ত্রুটি ঘটিলেই সুখ লাভে অন্তরায় ঘটে।

শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন বহু পরিমাণে সুখ নষ্ট হইয়া যায়। একটা চলিত কথায় বলে, "শরীরে সুখ না থাকিলে দেশে সুখ থাকে না।" কথাটা খুব ঠিক। যাঁহার দেহ পীড়ায় জর্জ্জরীভূত তাঁহার একটা মুহূর্ত্তও সুখের নহে, প্রতিক্ষণই তাঁহার মহা অশান্তিময়। শরীরী জীবের পক্ষে স্বাস্থ্য প্রধান সুখ এমনে স্বাস্থ্যতত্ত্বে সর্ব্বদা প্রগাঢ় দৃষ্টি রাখা সর্ব্বদা উচিত, এ সম্বন্ধে সাধারণতঃ নারীজাতি বড়ই উদাসীন ; কিন্তু এই উদাসীনতা তাঁহাদের অনেক সুখ নষ্ট করিয়া ফেলে ইহা সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত। অনেক সময় মানসিক প্রফুল্লতা দ্বারা শারীরিক বহু ব্যাধি উপশমিত হয়, কারণ মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ অতি নিকট—মনের গতি যখন যে ভাবে প্রবাহিত

হয়, শরীরও সেই গতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। মনকে প্রফুল্ল রাখিবার পক্ষে জ্ঞানই প্রকৃষ্ট উপায়। যিনি জ্ঞানী, জগতের কোন ক্ষোভই তাঁহাকে কাতর করিতে পারে না, তিনি জানেন, জগৎ সেই বিরাট পুরুষের প্রতিচ্ছায়া এখানে অসৎ কিছুই থাকিতে পারে না, জগতে যে সকল ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহা এই বিশাল বিশ্বের বাহ্য পরি-বর্ত্তন মাত্র। সাধুগণ চন্দন ও পঙ্ককে তুল্য জ্ঞান করেন সুতরাং তাঁহাদিগকে কোনরূপ দুঃখ প্রপীড়িত করিতে পারে না। যিনি জ্ঞান রাজ্যে সমাসীন হইতে পারেন তাঁহার সমস্তই সুখময়। এই জন্যই পুরাণকার বলিয়া-ছেন :—

শোক স্থান সহস্রানি ভয়স্থান শতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ় সংবিশন্তি ন পণ্ডিতং॥

বনপর্ব্ব ২—১৬।

অর্থাৎ শোকস্থান সহস্র সহস্র, ভয়স্থান শত শত, অজ্ঞ ব্যক্তিগণই উহাতে প্রতিনিয়ত নিপতিত হয়, সুধী ব্যক্তিগণকে তাহারা কদাচ বিচলিত করিতে পারে না।

তবেই দেখিতেছি, জ্ঞানই সুখলাভের প্রধান উপায়। জগতে সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল, এই বিশাল বিশ্ব পলে পলে পরিবর্ত্তিত হইতেছে তন্মধ্যে স্থূল পরিবর্ত্তন গুলিই আমরা অনুভব করিয়া সুখ দুঃখ আনন্দ বিষাদ প্রভৃতি লাভ

করিয়া থাকি। এ জগতে জন্মগ্রহণ করিলে এই সকল, আমাদিগকে অবশ্য সহ্য করিতে হইবে যিনি এই সকল ধীরচিত্তে সহ্য করিতে পারেন তিনিই সুখী। কোন মহাত্মা বলিয়াছেন "সুখের আশা পরিত্যাগ করিলে তবে সুখলাভ ঘটে"। মানুষ যতক্ষণ "সুখ সুখ" করিয়া আকুল পিপাসীর ন্যায় সংসারক্ষেত্রে ছুটিয়া বেড়ায়, ততক্ষণ এক বিন্দুও সুখ পায় না, কিন্তু মানব হৃদয় যখন সুখস্পৃহা ত্যাগ করিতে পারে তখনই তাঁহার অবস্থা শান্তিময় হয়! তাঁহার চক্ষে তখন সমগ্র জগত শান্তির প্রতিচ্ছায়া তখন আর কোন অভাবই তাহাকে দগ্ধীভূত করিতে পারে না।

তখন তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল—বদন হাস্যময়—সমস্ত জগতই যেন তাঁহার নিকট সুধা বর্ষণ করিতে থাকে। তিনি যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকই শান্তিপূর্ণ— সুখময়। জ্ঞানের অনুশীলনেই এই অবস্থা লাভ হয়। অতএব রমণী জাতির জ্ঞানানুশীলনে বিরত থাকা কদাচ উচিত নহে। জ্ঞান ব্যতীত হৃদয় পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না। হৃদয় পূর্ণত্ব প্রাপ্ত না হইলে সুখলাভ হয় না। যদি অর্থ পুত্রাদিতে পরিবেষ্টিত থাকিলে সুখলাভ হইত তবে পুত্র পৌত্র কলত্রাদি পরিবেষ্টিত অতুল ঐশ্বর্য্যাধিপতিকে সুখের চেষ্টায় বিরত দেখিতে পাইতাম। কিন্তু তাহা ত দেখিতে পাইনা। দেখিতে পাই পর্ণকুটীরবাসী দরিদ্র হইতে

বিশাল সাম্রাজ্যাধিপতি পর্য্যন্ত নিদাঘ চাতকবৎ সুখের পিপাসায় আকুল।

কৃষ্ণপ্রাণা শ্রীমতী রাধিকা, যিনি বৈষ্ণব শাস্ত্রাদিতে ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ছাড়িয়া এক দণ্ড থাকিতে পারেন না, একতিল কৃষ্ণবিরহ তাঁহার নিকট এক যুগ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার আরাধ্য—জীবনের শান্তি—হৃদয়ের প্রীতি—কৃষ্ণসঙ্গই তাঁহার সুখের চরম সীমা—কৃষ্ণসঙ্গ জন্য তিনি আত্মহারা, কিন্তু যখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছেন তখনই বা তাঁহার সুখ কৈ! তাঁহার সেই অবস্থার চিত্র প্রেমিক ভক্ত চণ্ডীদাস এইরূপ চিত্রিত করিয়াছেন ;—

"সুখের লাগিয়া, পীরিতি করিনু
শ্যাম বন্ধুয়ার সনে।
পরিণামে এত, দুখ হবে ব'লে,
কোন্ অভাগিনী জানে।
সই পীরিতি বিষম মানি!
এত সুখে এত, দুখ হবে ব'লে,
স্বপনে নাহিক জানি।
সে হেন কাঁলিয়া, নিঠুর হইল,
কি শেল লাগিল যেন,

দরশন আশে, যে জেন ফিরয়ে,
সে এত নিঠুর কেন ?
বলনা কি বুদ্ধি, করিব এখন
ভাবনা বিষম হইল,
হিয়া দগদগি, পরাণ পোড়নী,
কি দিলে হইবে ভাল।

কৃষ্ণময়ী শ্রীমতী রাধিকাও যখন পূর্ণ সুখ লাভ করিতে পারেন নাই, তখন আর অন্যে সুখ সম্ভোগ দ্বারা কিরূপে সুখী হইবে? সম্ভোগের দ্বারা সুখলাভ হয় না, তাহাতে তৃষ্ণা আরও বর্দ্ধিত হইয়া হৃদয় দগ্ধ হয় মাত্র। এই জন্যই শাস্ত্রকারগণ সুখলাভের জন্য সহিষ্ণুতার ব্যবস্থা করিয়াছেন, বাস্তবিক মনকে গঠিত করিতে পারিলেই প্রকৃত সুখ লাভ হয়, স্বীয় অবস্থাতে সন্তোষ লাভই হইতেছে মনকে গঠিত করিবার প্রধান উপায়। শোক দুঃখ অভাব প্রভৃতি যখন যে অবস্থায় পতিত হইবে, ধীর চিত্তে সহ্য করিয়া যাও দেখিবে তোমার চিত্ত কত প্রফুল্ল হইবে, দেখিবে সুখের সুরম্য ছবি আসিয়া তোমার চরণে বিলুণ্ঠিত হইবে। তুমি তাহাকে ধরিবার জন্য যতই আকুল প্রাণে ধাবিত হইবে,সে তোমার নিকট হইতে ততই দূরে পলায়ন করিবে, কিন্তু যে মুহূর্ত্তে তুমি তাহাকে ধরিতে নিরস্ত হইবে, দেখিবে অমনি সে আসিয়া তোমাকে আত্ম সমর্পণ না করিয়া থাকিতে পারিবে না।

গৃহস্থ ব্যক্তিকে প্রতিনিয়ত নানারূপ অভাব অশান্তির মধ্যে বাস করিতে হয়। এমতে স্বীয় অবস্থাতে সন্তোষ হইবার অভ্যাস করিতে পারিলে কোনরূপ দুঃখ আসিয়া চিত্তকে দগ্ধ করে না। হিন্দু শাস্ত্র বলেন ;—

সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলংহি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ ॥

মনু—৪—১২।

অর্থাৎ সন্তোষই সুখের জনক, যিনি সুখ লাভ করিতে চাহেন তিনি সন্তোষ অবলম্বন করিবেন ; অসন্তোষ হইতেই দুঃখের উৎপত্তি হয়।

বস্তুতঃ সন্তোষই সুখলাভের প্রকৃষ্ট উপায়, অতএব সন্তোষ অনুশীলন রমণী জাতির অবশ্য কর্ত্তব্য, নারীগণ যেন তাহা বিস্মৃত না হন।

দেবত্বলাভের উপায়।

যিনি জনসমাজে পূর্ণ আদর্শ তিনিই দেবতা। দয়া, মমতা, পরসেবা,পরদুঃখ-কাতরতা প্রভৃতি গুণাবলী বিকাশ প্রাপ্ত হইলেই দেবত্বলাভের বিকাশ হয়।

মহম্মদীয় সমাজে যখন ঘোর বিপ্লব চলিতেছিল, মহাত্মা মহম্মদ সেই সময় জনসমাজে আবির্ভাব হইয়া সমাজে শান্তি

স্থাপনা করিলেন, আপনার প্রাণ দিয়া অন্যের হিত সাধন করিতে লাগিলেন—এই সকল মহান্ গুণাবলীতে ভূষিত হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই মানব শিশু মহম্মদ বিধর্ম্মী হইলেও সমগ্র মানবের হৃদয়ে দেব ভাবে পূজিত হইতে-ছেন। মহম্মদ মহান্ গুণাবলীতে ভূষিত ছিলেন বলিয়াই মহম্মদ ঈশ্বরের সখা—মহম্মদ দেবতা।

খ্রীষ্ট-চরিত্রের অমূল্য গুণাবলী দর্শনে আমরা আত্ম-হারা, তাই তিনি বিদেশীয় হইলেও ঈশ্বরের পুত্র রূপে আমাদের চিত্ত জুড়িয়া রহিয়াছেন।

গুণই মানবের উপাস্য। যাঁহার গুণাবলী যতই উজ্জ্বল মানব সমাজে তিনি ততই পূজ্য। রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র অতুল্য গুণরাশিতে ভূষিত ছিলেন বলিয়াই আজ তিনি হিন্দুর দেবতা। তাই আজও লোকে রাম-রাজ্যের প্রার্থনা করে, তাই এখনও কোন অতীত গৌরব-কাহিনী স্মরণ হইলে "রাম নাই অযোধ্যা আছে" বলিয়া হিন্দু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে। তাই আজও ব্রতকালে বালিকাগণ রামের মত পতি প্রার্থনা করে।

মানবের গুণরাশি কিরূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইলে মানব দেব-পদবাচ্য হইতে পারে, শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্রা-লোচনা করিয়া দেখিলে আমরা তাহা বেশ বুঝিতে পারি।

শ্রীরামচন্দ্রের গুণে সকলেই তচ্চরণে আত্মহারা। যখন রাষ্ট্র হইল মহারাজ দশরথ শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ্য

ভার প্রদান করিতেছেন, তখন সমগ্র নগরে কি অপূর্ব্ব আনন্দ ধ্বনি উচ্ছ্বসিত হইল। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আনন্দে অধীর। শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যলাভ যেন তাঁহাদের নিজেরই রাজ্যলাভ বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। আবার যখন নগরবাসীগণ শ্রবণ করিলেন, পিতৃসত্য-পালনার্থে শ্রীরামচন্দ্র বনগমন করিতেছেন, তখন নগর কি গভীর বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! কোথায় সে আনন্দ রাশি, কোথায় বা শান্তির অপূর্ব্ব উচ্ছ্বাস। সকলের বদনমণ্ডল বিষাদ-কালিমায় সমাচ্ছন্ন! শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসে যেন তাঁহাদের নিজের বনবাস বলিয়াই বোধ হইতেছে।

শ্রীরামচন্দ্রের অতুল্য গুণে অসভ্য বানর জাতি ও নর-মাংসভুক্ রাক্ষস জাতি পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ! রাক্ষসরাজ দশানন শ্রীরামচন্দ্রের সহিত বৈরতাচরণ করিলেও অন্তিম সময়ে তাঁহাকে পরম পুরুষ জ্ঞানে তচ্চরণ প্রার্থনা করিয়াছেন। তদীয় পত্নী মন্দোদরীও এক সময় তাঁহাকে পরম পুরুষ সনাতন নামে অভিহিত করিয়াছেন।

কৈকেয়ী দেবী যখন মহারাজ দশরথের নিকট শ্রীরাম-চন্দ্রের বনবাস প্রার্থনা করিলেন, তখন তিনি শ্রীরামচন্দ্রের গুণাবলী কিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন দেখ,—রঘুনন্দন রাম স্বীয় জননীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে তোমার প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করে, যখন সমুদয় জীবলোকেই

রামের প্রশংসা করিয়া থাকে, তখন কি অপরাধে সেই প্রিয় পুত্র রামকে পরিত্যাগ করি। *

অযোধ্যাকাণ্ড।

এই ভূমণ্ডলে সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি অধিক শুশ্রূষা, গৌরব রক্ষা, অঙ্গীকৃত নির্ব্বাহ এবং লোক-প্রতিপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়? সহস্র সহস্র রমণী আছে, কিন্তু কোন রমণীই রামের নিন্দা করে না, এবং আমার অনেক ভৃত্য আছে তন্মধ্যে কোন ভৃত্যও অসূয়া পরবশ হইয়া তাহার প্রতি বৃথা অপবাদ ও দেয় না, সেই পুরুষবর বীর্য্যসম্পন্ন রঘুনন্দন রাম জনপদবাসী সকল প্রাণীকেই বিশুদ্ধ চিত্তে সান্ত্বনা করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে শুশ্রূষা করিয়া, যুদ্ধ করিয়া শত্রুদিগকে এবং সত্বগুণ দ্বারা সমুদয় লোককে বশীভূত করিয়া থাকেন এবং সত্য, দান, নির্লোভতা, তপস্যা, মিত্রতা, পবিত্রতা, সরলতা, বিদ্যা ও গুরুশুশ্রূষা এইসকল গুণ রামে সর্ব্বথা রহিয়াছে।*

অযোধ্যাকাণ্ড—২৬—৩১

শ্রীরামচন্দ্র কোন্ কোন্ গুণে ভূষিত হইয়া দেব অবতার নামে অভিহিত হইয়াছেন, মহারাজ দশরথের উক্তিতে তাহা বিশেষ রূপে বুঝিতে পারা যায়।

---

* কৃতজ্ঞ হৃদয়ে জানাইতেছি যে ষ্টার চিহ্নিত অংশগুলি বঙ্গবাসীর অনুবাদিত রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছি। (গ্রন্থকর্ত্রী।)

সীতার অগ্নি-পরীক্ষা, সীতা ত্যাগ, লক্ষ্মণ বর্জ্জন এই তিনটা নিষ্ঠুর কার্য্যকে কেহ কেহ শ্রীরামচন্দ্রের নির্ম্মল চরিত্রের কলঙ্ক বলিয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা কলঙ্কের নিদর্শন নহে; বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যায় সীতা দেবীর অগ্নিপরীক্ষা সীতা দেবীর গৌরব বর্দ্ধনের জন্যই সূচিত হইয়াছিল। সীতা ত্যাগ ইহা শ্রীরামচন্দ্রের প্রজা বৎসলতার পরাকাষ্ঠা। সীতাকে ত্যাগ করিয়া তিনি দ্বিতীয় দ্বার গ্রহণ করেন নাই এবং এক দিনের জন্যও সুখী হন নাই তাহা আমরা মহাত্মা বাল্মীকির তুলিকায় উজ্জ্বল-রূপে দেখিতে পাই। প্রজার জন্য নিজের সুখত্যাগ করিতে এতাবৎ আর কেহই সমর্থ হন নাই, সীতা ত্যাগ আর কিছুই নহে, প্রজারঞ্জনার্থে তাঁহার আত্মসুখ বলিদান মাত্র। আর লক্ষণবর্জ্জন ইহাতে তাঁহার সত্যনিষ্ঠতারই জয় ঘোষণা হইতেছে। এই ত্রিবিধ কার্য্য সাধারণতঃ লোক-লোচনে ক্লেশকর বা অসঙ্গত বিবেচিত হইলেও প্রকৃত পক্ষে এই ত্রিবিধ কার্য্যের দ্বারা শ্রীরাম-চরিত্র অধিকতর উজ্জ্বলীকৃত হইয়াছে।

নিবিষ্টান্তঃকরণে রামায়ণ অধ্যয়ন করিলে শ্রীরামচন্দ্রের মহান্ গুণ রাশিতে আকৃষ্ট না হইবেন এমন কেহ নাই। শ্রীরামচন্দ্রকে আদর্শরূপে স্থাপিত করিয়া তদীয় গুণরাশি সম্যকরূপে অনুশীলন করিতে পারিলে মানুষ দেবত্বলাভ করিতে পারে। মানবের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকল

সমুচিতরূপে অনুশীলিত হইলেই দেবত্বলাভ হয়, যিনি এইরূপ দেবত্বলাভ করিতে পারেন, তাঁহার সংসর্গে স্বজন ধন্য ও তিনি নিজে কৃতার্থ হইয়া থাকেন। দেবতা বলিয়া জগৎ তচ্চরণে বিলুণ্ঠিত হন।

তাঁহার কার্য্য জগতের শান্তি, তাঁহার কার্য্য জগতের সুখ, তাঁহার আচরণ জগতের অনুকরণীয়, তাঁহার বাক্য বিশ্বের উপমা। ফল কথা এ হেন দেব প্রকৃতি ব্যক্তিই জগতে দেবতা নামে অভিহিত হইয়া সমগ্র লোকচিত্তাকর্ষণ পূর্ব্বক বিশাল বিশ্বে পূজিত হইয়া থাকেন। জীবন নশ্বর হইলেও তিনি মৃত্যুঞ্জয়।

মানবসমাজে এই দেবত্ব বিকাশ পক্ষে নারী জাতিই প্রধান সহায়। তাঁহারা এই গুণাবলী উপলব্ধি পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় পুত্র কন্যার চরিত্রে তাহা অঙ্কিত করিয়া না দিলে মানব চরিত্র গঠিত হওয়া দুরূহ। এই জন্যই বলিতে হয় সর্ব্বাগ্রে নারী জাতির উন্নতি সাধন প্রয়োজন, এই প্রয়োজন সাধিত হইলেই সমাজে দেবত্বের বহুল বিকাশ হইবে।

ধর্ম্মের লক্ষণ।

সংসারে থাকিয়া সতত পবিত্রতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হইবে। কোন্‌টা পবিত্র কোন্‌টা অপবিত্র অনেক সময় তাহা ঠিক ধারণায় কুলায় না। অনেক সময় পাপ ও পুণ্যের মুখস পরিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সুতরাং পাপানুষ্ঠানের ইচ্ছা না থাকিলেও জ্ঞানের অনুৎকর্ষতাহেতু আমরা নানাবিধ পাপানুষ্ঠান করিয়া ফেলি, এই জন্যই জ্ঞানের উৎকর্ষতা সাধন করিতে চেষ্টা করা পুরুষের ন্যায় স্ত্রী-জাতিরও সবিশেষ প্রয়োজন। পিতা মাতা শিক্ষক গুরু প্রভৃতির নিকট সৎশিক্ষা গ্রহণ ও সৎগ্রন্থানুশীলন করিলে প্রকৃতই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া মানুষ সদসৎ নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হয়।

শাস্ত্রে ধর্ম্ম লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

ক্ষমা সত্যং দমঃ শৌচং দানমিন্দ্রিয় সংযমঃ।
অহিংসা গুরু শুশ্রূষা তীর্থানুসরণং দয়া॥
আর্জ্জবং লোভ শূন্যত্বং দেব ব্রাহ্মণ পূজনং।
অনভ্য সূয়াচ তথা ধর্ম্মঃ সামান্য উচ্যতে॥

বিষ্ণু সংহিতা।

অর্থাৎ ক্ষমা ও সত্যানুরাগ এবং বিষয়াসক্তি শূন্য, পবিত্র অন্তঃকরণ, ইন্দ্রিয় সংযম, দান, অহিংসা, গুরুজনবর্গের সেবা, তীর্থভ্রমণ, জীবের প্রতি দয়া, লোভ শূন্যতা, দেবতা ব্রাহ্মণানুরাগ প্রভৃতিই ধর্ম্মের লক্ষণ।

যে সকল কার্য্য ও ব্যবহার প্রভৃতিতে এই সকল গুণ গুলির বিকাশ হয়, তদ্দিকে দৃষ্টি রাখিয়া জীবনকে পরিচালিত করিতে পারিলে জীবন সার্থক হয়। সেই কার্য্যই ধর্ম্মানুগত। মনুও বলিয়াছেন,—

ধৃতি ক্ষমা দমো স্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্ম্মলক্ষণং। মনু।

সন্তোষ, ক্ষমা, বিষয় সংসর্গ ও চিত্তবিকার রহিত পরস্বাপহরণ না করা ও আত্ম পবিত্রতা, শাস্ত্রমর্ম্মার্থবগত আত্মজ্ঞান লাভ, সত্যানুসরণ এবং অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ।

ধীর চিত্তে এই দশবিধ ধর্ম্ম লক্ষণ বিচার পূর্ব্বক কার্য্য করিলে সংসারে কোন রূপ অশান্তির কারণ থাকেনা। সংসারে যে এত জ্বালা যন্ত্রণা ধর্ম্মপ্রাণতা-শৈথিল্যই তাহার প্রধান কারণ। ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে পারিলে সংসার অতুল সুখপূর্ণ হয়। এই দশ বিধ ধর্ম্ম লক্ষণ পরিজ্ঞাত হইয়া তদনুযায়ী কার্য্য করা স্ত্রী জাতির ধর্ম্ম। ইহার প্রত্যবায়ে সমাজে অশান্তি-অনল প্রজ্জ্বলিত

হয়। সুতরাং স্ত্রী জাতির আত্মা ও ধর্ম্মের অনুশীলন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আমরা শাস্ত্রোক্ত যে দশবিধ ধর্ম্ম লক্ষণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম তাহা প্রতিপালন করিতে পারিলেই হৃদয় এক সময় ঈশ্বরের মন্দিরবৎ পবিত্র হইয়া সংসার ও সমাজে অমৃত বর্ষণ করিবে।

ঈশ্বর চিন্তার ফল।

সংসারে শান্তিলাভ করিতে হইলে আর একটি কার্য্যের প্রয়োজন। "আমার সংসার আমি করিতেছি, আমার যাহা অভিরুচি আমি করিব" এরূপ বিবেচনা ভাল নহে। তুমি তোমার সংসারের সর্ব্বেসর্ব্বা হইতে পার—সমাজের শীর্ষ স্থানীয়া হইতে পার; কিন্তু তোমার উপর এক জন আছেন; শুধু তোমার উপর নহে—সমগ্র জগতের উপর তিনি প্রভুত্ব করিতেছেন—তাঁহারই নিয়মে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রিত—সকলের শক্তির উপর তাহার শক্তি ক্রিয়া করিতেছে। সেই শক্তিমানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মানবের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য সাধিত করিতে পারিলেই মানব ঐশী শক্তি লাভ করিতে পারে। ঈশ্বর চিন্তার ফলে মানবের চিত্ত শক্তির আধার

হয়—প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ হয়। মানবের মনের গতি বায়ু অপেক্ষা প্রবলীভূত। সেই আবেগময় হৃদয় প্রতি নিয়ত নানাবিষয়ে আবদ্ধ হইয়া মানুষকে নানারূপ যন্ত্রণায় নিপীড়িত করিয়া থাকে। একমাত্র ঈশ্বর চিন্তার দ্বারাই সে যন্ত্রণা নিরাকৃত হয়। ঈশ্বর বিশ্বাস মনুষ্যত্ব রক্ষার সুদৃঢ় শৃঙ্খল। সেই শৃঙ্খল ছিন্ন হইলে মানব ঈশ্বরকে বিস্মৃত হইয়া সংসার সমাজে এবং নিজ জীবনকে দারুণ অশান্তিময় করিয়া তুলে। বুদ্ধদেব বৌদ্ধধর্ম্মের শৃঙ্খল। যখন বৌদ্ধগণ সেই শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ফেলিল, তখন তাহাদের অবস্থা অতিশয় ভীষণ হইয়া উঠিল, তাহারা বৌদ্ধধর্ম্মের কেন্দ্রচ্যুত হইয়া সমাজ বিপ্লব করিয়া তুলিল।

জীবনের একটা শৃঙ্খল না থাকিলে অধঃপতিত হওয়াই মানবের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী। এই জন্যই হিন্দুঋষিগণ এবং মহাত্মা যিশু ও মহম্মদ মানুষকে সর্ব্বদা পরমেশ্বরের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। পরমেশ্বরই দুর্ব্বল মানবকে ঠিক রাখিবার সুদৃঢ় শৃঙ্খল, সেই শৃঙ্খল সুদৃঢ় থাকিলে এক দিন না এক দিন ঐশী শক্তি লাভ করিয়া মানব গার্হস্থ্যধর্ম্মও সমাজকে শান্তি প্লাবিত করিতে সমর্থ হইবে। যে কার্য্য শারীরিক বলের দ্বারা সুসাধিত না হয়, সে কার্য্য মানসিক একাগ্রতা দ্বারা অবশ্যই সুসাধিত হয়। ঈশ্বর চিন্তা হইতেই এরূপ একাগ্রতার উৎপত্তি হয়। 'এইরূপ একাগ্রতার

নামই ঐশী শক্তি। এই ঐশী শক্তিকে যে দিকে নিয়োজিত করিবে সেই দিকেই শুভফল উৎপন্ন হইবে। নারী জাতি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের শৃঙ্খল। সংসারে তাঁহাদের দায়িত্ব বড়ই অধিক। এইজন্যই শিবমোহিনী পার্ব্বতী সংসার পালনকর্ত্রী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। স্ত্রীজাতির স্তন্য পান করিয়া মানব বর্দ্ধিত হয়। মানুষ জন্মগ্রহণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে জননীর মুখ দেখিতে পায়, প্রতিনিয়ত মাতার আচার ব্যবহার সন্দর্শনে তাহারা মাতার অনুরূপ চিত্র হইয়া থাকে। এমতে প্রত্যেক মাতা সুমাতৃত্ব লাভ করিতে পারিলে পুত্র কন্যা সৎ প্রকৃতি সম্পন্ন হইবে। নারী জাতির উন্নতিতে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও সামাজিক উন্নতির নির্ভর করিতেছে, ইহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।

ঈশ্বর চিন্তা হইতে কর্ত্তব্য জ্ঞান বিকশিত হয়, হৃদয়ের মলিনতা বিলুপ্ত হয়, অনন্ত শোক যন্ত্রণা বিদূরিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানে হৃদয় উদ্ভাসিত হয়, কর্ত্তব্যজ্ঞান উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সমগ্র জগত আনন্দময় হয়, ইহাই ঈশ্বরের-চিন্তার অমৃতময় ফল।

প্রেম।

মানবের যখন সম্যকরূপ জ্ঞান লাভ হয় তখনই প্রকৃত প্রেমের বিকাশ হয়। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি যে প্রেম তাহা প্রেম নহে, তাহা মোহ মাত্র। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতী রাধিকার ঐকান্তিক অনুরাগ, কিন্তু সেই অনুরাগ ব্যক্তি বিশেষের প্রতি আবদ্ধ হইয়াও সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি শ্রীকৃষ্ণপদে সমাধি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাই এই বিশাল বিশ্বে তিনি শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেন না। বিশ্ব তাঁহার নিকট কৃষ্ণময়, ইহাই প্রকৃত প্রেম, ইহাই প্রেমের পরাকাষ্ঠা।

মানুষ সংসারে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে প্রেম-রাজ্যে কেমন উপনীত হইতে পারে, কবিবর নবীন সেন তাঁহার কৃত কুরুক্ষেত্র কাব্যে সুভদ্রার মুখে তাহা প্রচার করিতেছেন ;—

জনক জননী মুখ শিশুর ক্ষুদ্র জগত,
শিশু কিছু নাহি জানে আর।
ক্রমে বাড়ে পরিসর, কিশোর কিশোরী দেখে,
ভ্রাতা ভগ্নি পূর্ণ এ সংসার ;

পতি পত্নী প্রেম রঙ্গে যৌবনে ছুটে তরঙ্গে,
আলিঙ্গিয়া ভূতল গগন।
ক্রমে সন্তানের স্নেহ, দেখায় অনন্ত মুখ,
পুণ্যতীর্থ সাগর সঙ্গম।
প্রেম ধর্ম্ম এই দিদি, কালিকৃষ্ণার্জ্জুন মত
দেখিতাম সকল সংসার।
মাতৃস্নেহ পূর্ণ বুকে, আজি দেখিতেছি সব
অভিমন্যু উত্তরা আমার।
পিতা মাতা ভগ্নি ভ্রাতা, পতি পুত্র মহাবিশ্বে,
এই প্রেম তৃপ্তি নাহি পায়।
এ অনন্ত বিশ্ব ছাড়ি কি যে গো অনন্ত আছে
প্রেম-সিন্ধু সেই দিকে ধায়।

কুরুক্ষেত্র।

এই কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য। পিতা মাতা হইতে আরম্ভ হইয়া প্রেম ক্রমে বিশ্ব বিসারি পূর্ব্বক অনন্ত মুখে ধাবিত হয়। অতএব এই সংসারই প্রেম শিক্ষার স্থল তাহা নিশ্চিত বলিতে পারা যায়। গার্হস্থ্য ধর্ম্মে প্রেম পরিস্ফুরণের যেমন সুন্দর উপায় আছে এমন আর অন্যত্রে নাই। ইহাতে গার্হস্থ্য ধর্ম্মেরই গৌরব কীর্ত্তিত হইতেছে। প্রেমে শত্রু মিত্র ভেদ জ্ঞান তিরোহিত হয়। শত্রু মিত্র ভেদ জ্ঞান ক্ষুদ্রতার কার্য্য। প্রেম মহান্, তাহার কার্য্যও মহান্। চন্দ্র যেমন ধনীর সৌধ, দরিদ্রের কুটীর নির্ব্বাচন

না করিয়া সমভাবে রশ্মি বিকীরণ করিয়া থাকে, প্রেমও তদ্রূপ শত্রু মিত্র আত্মপর বাছাবাছি না করিয়া সমভাবে সমগ্র বিশ্বের প্রতি অর্পিত হয়। অন্যের জন্য যিনি স্বীয় জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত প্রেমের অধিকারী। প্রেমিক কবি চণ্ডীদাসের মতে সেই প্রেমিক "যে আপনা ভুলিয়া পরেতে মিশাতে পারে।" যিনি প্রেমিক তিনি জানেন না কেন ভাল বাসেন অথচ তাঁহার ভাল বাসা বিশ্বব্যাপী। প্রেমিককে জিজ্ঞাসা কর "কেন ভালবাস?" তিনি বলিবেন "কেন ভালবাসি জানি না ভাল বাসি বলিয়া ভালবাসি।" কোন মহাত্মা ইংরাজিতে বলিয়াছেন, প্রেমই আমার ধর্ম্ম * এই কথাটি বাস্তবিকই বড়ই মধুর ও হৃদয়গ্রাহী, ইহাই প্রকৃত প্রেমিকের উক্তি।

"ভাল বাসিবে বলে ভালবাসিনা
আমার স্বভাব কেমন তোমা বই আর জানিনা।"

নিধুবাবু।

প্রকৃত প্রেমিক ব্যতীত অন্যের হৃদয় হইতে এরূপ বাক্য উত্থিত হয় না।

কি স্ত্রী কি পুরুষ এই পবিত্র প্রেম রত্নের অধিকারী সকলেই সমভাবে হইতে পারেন। তাহাই দেখাইবার জন্য মহাত্মা বাল্মীকি নির্দ্দয় রাক্ষস পুরীতে প্রেমময়ী সরমার

* "Love is my religion."

সৃষ্টি করিয়াছেন। প্রেম তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মরূপে সীতা দেবীর প্রতি নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সীতা দেবী অগাধ প্রেম-শক্তি বলেই সুকোমলা রাজকন্যা হইয়াও কাননচারিণী হইতে পারিয়াছিলেন। অপরিসীম প্রেমের বলেই সত্যবানের অল্পায়ু পরিজ্ঞাত হইয়াও সাবিত্রীদেবী তাঁহাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে বিরত হন নাই, সত্যবানের পুনর্জ্জীবন লাভ সাবিত্রীর অগাধপতি প্রেমেরই জয় ঘোষণা করিতেছে। আর রমণী-চরিত্রে এই মহান্ প্রেমের বিকাশ দেখাইয়াছেন কবিগুরু কালিদাস।

ঋষি দুহিতা শকুন্তলা মহারাজ দুষ্মন্তের প্রতি ঐকান্তিক প্রেমবতী হইয়াও সমস্ত প্রাণীকে অজস্র স্নেহ ধারা বর্ষণ করিয়াছেন। আশ্রমবাসী সকলেই এমন কি বন্য পশু গুলি পর্য্যন্ত তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিল। শকুন্তলা পতি গৃহে যাত্রাকালে প্রত্যেক তরুলতা ও পশু পক্ষিটির জন্যও আকুল হইয়াছিলেন, তাঁহার পালিতা গর্ভিণী হরিণীটি প্রসব করিলে তাঁহাকে সংবাদ দিবার জন্য পিতাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন ও পতিপাশে গমনশীলা যে বিরহিণী রমণী বন্য হরিণীটির চিন্তাও হৃদয়ে পোষণ করে, সে হৃদয়ের প্রেম কি অমূল্য! কি মহান্! কি মধুর বিশ্বব্যাপী! এরূপ রমণী-সংসগে সংসার ও সমাজ যে অমৃতপূর্ণ হয় তাহা বলাই বাহুল্য!!

বরেণ্য কবিবর নবীন সেন সুভদ্রার চরিত্রে দেখাইয়াছেন

যে, রমণী জাতি প্রেম রাজ্যের চরমসীমায় কতদূর উপনীত হইতে পারে। সুভদ্রাকে দিয়া কবি বলাইয়াছেন,—

না, দিদি আমরা নারী বিশ্ব জননীর ছবি
আমাদের শত্রু মিত্র নাই।
বরিষার ধারা মত অজস্র জননী প্রেম
সর্ব্বত্র ঢালিয়া চল যাই,
মিত্রকে যে ভালবাসে, সকাম সে ভালবাসা
সেত ক্ষুদ্র ব্যবসায় ছার।
শত্রু মিত্র তরে যার, সমভাবে কাঁদে প্রাণ
সেই জন দেবতা আমার।

কুরুক্ষেত্র।

পরের জন্যে সুভদ্রা কতদূর আত্মহারা, সুলোচনা তাহা এই রূপ প্রকাশ করিতেছেন,—

অভাগী এরূপে কি লো, অনিদ্রায় অনাহারে
খোয়াইবি দেহ আপনার ?
নাহি রাত্রি নাহি দিন, থাক প্রলেপের মত
লাগি অঙ্গে আহত সবার।
শিবিরে শিবিরে ঘুরি, আহতের শুশ্রূষায়,
হইয়াছে কি দশা তোমার।
বসিয়া গিয়াছে চোখ, মলিন বিবর্ণ মুখ,
ধূলায় ধূসর কেশভার।

আজি একাদশ দিন, বাধিল এ পোড়ারণ,
দেখি নাই তব হাসি মুখ।
এই রূপ রাত্রিদিন মরিয়া মড়ার তরে
নাহি জানি পাও কিবা সুখ।

কুরুক্ষেত্র।

ইহা বিশ্ব প্রেমিকতারই অন্তর্গত। প্রত্যেক নর নারীর হৃদয়ে প্রেম উৎস লুক্কাইত আছে, স্বার্থের আবর্জ্জনায় সেই ফোয়ারার মুখ আবদ্ধ হইয়া থাকে, অনুশীলন রূপ কোদালীর দ্বারা সেই ফোয়ারার মুখ পরিষ্কৃত করিয়া দিতে হয়, তবেই বিশ্ব প্রেমের বিকাশ হয়।

নারী জাতি বিশ্ব-প্রেমিকা হইতে পারে না এ ধারণা ভ্রান্ত। অধিকন্তু নারী জাতির প্রেমেই জগত সঞ্জীবীত, বিশ্বময়ের বিশ্ব রাজ্য নারী জাতির প্রেমেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া সুখ শান্তিতে পরিপূর্ণ। রমণী হৃদয় প্রেমশূন্য হইলে সংসার জ্বালাময়ী মরুভূমিবৎ হইয়া পড়িবে। মানবের মাতা কন্যা ভগ্নি প্রভৃতি প্রেমের প্রস্রবণ! ইহাঁদের প্রেমই প্রতিনিয়ত ওতোপ্রোত হইয়া মানব হৃদয়ে অনন্ত প্রেমের বিকাশ করিয়া দেয়। অতএব নারী জাতিকে ঘৃণা করিয়া তাহাদের উন্নতি কল্পে অমনোযোগী হইলে সমগ্র মানবের উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। নারী জাতির কুসংস্কার ও কুশিক্ষার ফলে বহু শান্তিময় সংসার অশান্তির প্রপীড়নে বিধ্বস্ত হইয়া থাকে। তাহা আমরা

প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষাবলোকন করিতেছি। অতএব নারী-জাতি যাহাতে সত্য শিক্ষা লাভ করিয়া বিশ্বপ্রেমের অধিকারিণী হইয়া সংসার, সমাজ ও নিজ জীবনকে মধুময় করিয়া তুলিতে পারেন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা সমাজের অবশ্য কর্ত্তব্য।

স্ত্রীজাতির উন্নতিতেই ব্যক্তিগত উন্নতি এবং তাহা হইতেই সামাজিক উন্নতি হয়। নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নাম কে না শুনিয়াছেন। নেপোলিয়ান যে এত উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা কেবল তাঁহার মাতার গুণে। একথা তিনি নিজেই পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন। অতএব কেবল পুরুষের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি সম্ভবপর নহে। ভারতের জন সংখ্যায় পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রী জাতির সংখ্যাই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সমাজের অর্দ্ধাংশের অধিক যদি অশিক্ষিত হইয়া রহিল তবে আর সামাজিক উন্নতি কিরূপে সাধিত হইবে। যদি প্রকৃতই মানবীয় উন্নতি লাভ করিতে হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে নারী জাতিকে উন্নীত করিতে হইবে।

কোন যুগে কোনও সমাজে স্ত্রীজাতির শক্তি ব্যতীত পুরুষ কেবল মাত্র নিজের শক্তিতে শক্তিমান হইতে পারেন নাই, তাহার বহু নিদর্শন দেওয়া যাইতে পারে। এমতে নারী জাতির গার্হস্থ্য জীবনের উন্নতি সাধিত করিতে চেষ্টা করা অবশ্য উচিত।

সাধারণতঃ স্ত্রী জাতি ইন্দ্রিয় সেবাকেই প্রেম নামে অভিহিত করিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করেন; কিন্তু ইন্দ্রিয় সেবার সহিত প্রেমের তুলনা হইতে পারে না। প্রেম স্বর্গীয় বস্তু। প্রেমের স্বরূপ কি প্রকার, তাহার বেগবত্তা কি রূপ ভাবে নিয়ন্ত্রিত এই প্রস্তাবে তাহা কথঞ্চিত আলোচনা করা গেল। নারী জাতি ইহাতে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক প্রকৃত প্রেমানুশীলন করিলে কৃতার্থ হইবেন এবং সংসারে ও সমাজে অমৃত বর্ষণ হইবে।
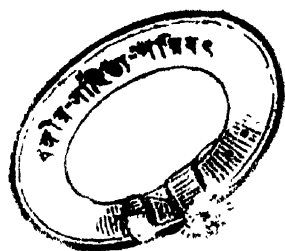
পরিশিষ্ট।

নারী জাতি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সহিত প্রগাঢ়রূপে সংবদ্ধ। এমতে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের জানা উচিত যে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য কি ও গার্হস্থ্য জীবনে নারীজাতির কর্ত্তব্য কি, এবং কিরূপে ধর্ম্মজীবন রক্ষা ও জাতীয় উন্নতি লাভ হয়, কিরূপ ভাবে জীবন পরিচালিত করিলে সাধুতা ও সংযম আচরণ হইতে পারে, মানুষ কিরূপে দেবত্বলাভে সমর্থ হয়, সাহিত্যের অভ্যন্তরে মানবীয় উন্নতি বা অবনতি নিহিত আছে কিনা? বিবাহ পদ্ধতির শুভাশুভ, দম্পতি ধর্ম্ম, শিক্ষক ও আচার্য্যের দায়িত্ব কিরূপ প্রগাঢ় [illegible] নারী জাতি কিরূপ জড়িত, সুখের উপায় কি, জ্ঞান এবং ধর্ম্মের লক্ষণ, ঈশ্বর চিন্তার ফল ও প্রেমের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া তদনুরূপে জীবন পরিচালিত করা নারী জাতির উচিত।

ঐ বিষয়গুলির অনুশীলন নারীজাতির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনায় আমরা এই গ্রন্থে তাহার কথঞ্চিত আলোচনা করিয়াছি। এমন কি ঐ কয়েকটী বিষয়ই গাহস্থ্য ধর্ম্মের প্রধান উপাদান বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

নারী জীবনে এই কর্ত্তব্য সকল প্রতিপালিত হইলেই মৃত ভারত আবার জাগিবে, সতীর গৌরবে জগত প্রভাসিত হইবে। পুরুষের ক্রীড়া পুত্তলী হইয়া থাকাই

সতীত্বের পরিচায়ক নহে—আত্মত্যাগই সতীর ভূষণ। সং শিক্ষা হইতেই আত্মত্যাগের বিকাশ হইয়া সতীত্ব ভিত্তি দৃঢ় হয়। নারী জাতির সতীত্বই সমাজোন্নতির মূল ভিত্তি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের সুখ ও অমৃত ছবি।

সংশিক্ষার প্রভাবেই প্রাচীনা মহিলাদিগের পবিত্র নাম জগতে প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। আমরা এই গার্হস্থ্য ধর্ম্মে যে কয়টি বিষয়ের আলোচনা করিলাম, রমণীজাতি এই বিষয় গুলিতে পারদর্শিতা লাভ করিতে পারিলে নারী জাতির গৌরব রক্ষা ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। আবার নারী জাতির পবিত্র নাম ভারতের বক্ষে সুবর্ণাক্ষরে প্রতিবিম্বিত হইবে।

সমাপ্ত।

বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, বসুমতী, চারুমিহির, নব্যভারত, বামাবোধিনী প্রভৃতি সুবিখ্যাত সংবাদপত্র ও সাময়িক-পত্রিকাদিতে বিশেষরূপে প্রশংসিত।

সুধীজন কর্ত্তৃক প্রশংসিত সুকবি শ্রীযুক্তবাবু অখিলচন্দ্র পালিত প্রণীত ঃ—হৃদয়গাথা ‥ ১।০

বর্দ্ধমান বিভাগীয় ভূতপূর্ব্ব স্কুল্ ইন্স্পেক্টর ও উৎকল কবিগুরু রায় রাধানাথ বাহাদুর প্রণীত ঃ

লেখাবলী (বঙ্গভাষায় মধুর ও বিশুদ্ধ অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত) … ‥ … ।৶০

ঐ সকল গ্রন্থাবলী কলিকাতা ২০১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, ২০নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরীতে এবং ৬৭নং কলেজষ্ট্রীট সিটী বুক সোসাইটীতে ও শ্রীযুক্তবাবু খগেন্দ্রনাথ মুস্তোফী, সবরেজি-ষ্ট্রার, জামালপুর, জেলা বর্দ্ধমান এই ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

দ্রষ্টব্য ঃ—

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা সরস্বতী প্রণীত গ্রন্থাবলীগুলি শ্রীযুক্তবাবু খগেন্দ্রনাথ মুস্তোফীর নিকট হইতে ক্রয় করিলে গ্রন্থকর্ত্রীর লিখিত উড়িষ্যার মহানদীবক্ষঃস্থিত মনোরম ধবলেশ্বর শৈলের প্রকৃতি সৌন্দর্য্যবর্ণনাত্মক ও ডিষ্ট্রীক্ট জজ্ বরদাচরণ মিত্র, কমিশানার্ প্রভৃতি প্রশংসিত একখানি সুমধুর কাব্য গ্রন্থ উপহার পাইবেন।